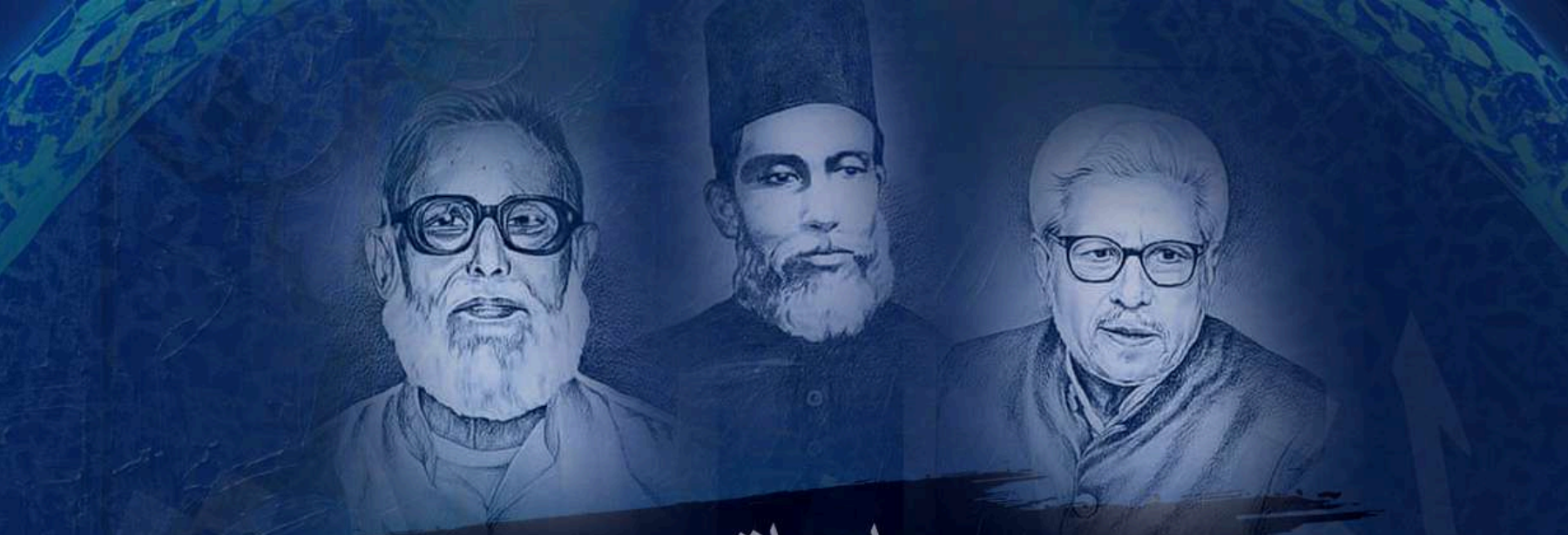

اشراق

Ishraq USA | Bangla Edition

ইশরাক বাংলা সংস্করণ। মার্চ ২০২৬

আল-ইশরাক

বাংলা

সম্পাদক: মাওলানা উমর ফারুক

সম্পাদনা পরিষদ:

মঞ্জুর এলাহী

হুমায়ুন কবির

মোহাম্মদ সিয়াম হোসেন

ইমদাদ হোসেন

www.ghamidi.org

اشراق
Ishraq USA | Bangla Edition
ইশরাক বাংলা সংস্করণ। মার্চ ২০২৬

আল-ইশরাক

বাংলা

সূচিপত্র

১) কুরআনের তরজমা : সুরা বাকারা [১-১৬] ৩

২) দরসে হাদিস : রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবিদের সাথে নিয়ে শেবে আবি তালিবে যাওয়া ৬

৩) ধর্ম ও জ্ঞান : জ্ঞান ও যুক্তি-প্রমাণ ৮
: খোদাতায়ালার ওপর ইমান ১১
: রিসালাতের বিশেষ আইন ২৩

৪) তাত্ত্বিক পর্যালোচনা: ইলমে কালামের ওপর গ্রিক দর্শনের প্রভাব ২৯
- খিলাফত ৩৬

৫) মনীষা ও মনন : মওলানা সাইয়্যিদ আবুল আলা মওদুদি – এক যুগান্তকারী চিন্তাবিদ ৪১

৬) সাহিত্য : কবিতা ৫১

Ghamidi Center of Islamic Learning
www.ghamidi.org
AN INITIATIVE OF AL-MAWRID US.

কুরআনের তরজমা

সুরা বাকারা

জাভেদ আহমেদ গামিদি

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِکَ الۡکِتٰبُ لَا رَیۡبَ ۛۚ فِیۡہِ ۚۛ ہُدًی لِّلۡمُتَّقِیۡنَ ۙ﴿٢﴾ الَّذِیۡنَ
یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَیۡبِ وَ یُقِیۡمُوۡنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا رَزَقۡنٰہُمۡ یُنۡفِقُوۡنَ ۙ﴿٣﴾
وَ الَّذِیۡنَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکَ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِکَ ۚ وَ بِالۡاٰخِرَۃِ
ہُمۡ یُوۡقِنُوۡنَ ؕ﴿٤﴾ اُولٰٓئِکَ عَلٰی ہُدًی مِّنۡ رَّبِّہِمۡ * وَ اُولٰٓئِکَ ہُمُ
الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿٥﴾

অনুচ্ছেদ ১ (আয়াত ১ - ৫)

এটা ‘আলিফ-লাম-মিম’ নামের সুরা। এটা আল্লাহর কিতাব, এর আল্লাহর কিতাব হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।হেদায়েত সেই খোদাভীরুদের জন্য, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে এবং নামাজের ব্যবস্থা করে, আর আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে (আমাদের পথে) ব্যয় করে। আর যারা বিশ্বাস করে সেটার ওপর, যা তোমার প্রতি নাজিল করা হয়েছে এবং সেটার ওপরও, যা তোমার আগে নাজিল করা হয়েছে; আর তারা আখেরাতের ওপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। এরাই নিজেদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হেদায়েতের ওপর রয়েছে এবং এরাই সফলকাম।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۶﴾ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ عَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَ عَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۷﴾

অনুচ্ছেদ ২ (আয়াত ৬ - ৭)

এর বিপরীতে যেসব লোক এই কিতাব না মানার ফয়সালা করেছে, তাদের জন্য একই কথা, তুমি তাদেরকে সতর্ক করো বা না করো, তারা মানবে না। তাদের অন্তরে এবং কানে আল্লাহ (নিজের আইন অনুযায়ী) মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চোখে পর্দা রয়েছে, আর (কিয়ামতের দিন) এক বড় আজাব রয়েছে, যা তাদের জন্য অপেক্ষমাণ।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۘ﴿۸﴾ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَ مَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ؕ﴿۹﴾ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿۱۰﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْۤا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿۱۱﴾ اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَ لٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَاۤ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ كَمَاۤ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَ لٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳﴾ وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْۤا اٰمَنَّا ۚ وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۱۴﴾ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۱۵﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۪ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿۱۶﴾

অনুচ্ছেদ ৩ (আয়াত ৮ - ১৬)

আর এই লোকদের মধ্যেই সেই (মুনাফিকরা) রয়েছে, যারা বলে: 'আমরা আল্লাহকে মেনেছি এবং কিয়ামতের দিনকে মেনেছি', অথচ তারা এর কোনো কিছুকেই মানে না। তারা আল্লাহ এবং ইমানদারগণ – উভয়কে প্রতারিত করতে চায়, আর বাস্তবতা হলো এই যে, তারা নিজেদেরই প্রতারিত করছে, কিন্তু তারা এর চেতনা রাখে না। তাদের অন্তরে (হিংসার) ব্যাধি ছিল, তাই আল্লাহ তাদের এই ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে যে, তারা মিথ্যে বলত, আর তাদের জন্য রয়েছে বড় যন্ত্রণাদায়ক আজাব। যখন তাদেরকে বলা হয়, (তোমাদের এই আচরণের মাধ্যমে) তোমরা এই জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তখন জবাবে বলে: 'আমরাই তো সংশোধনকারী। সাবধান, এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা এটা অনুভব করছে না। যখন তাদের বলা হয়, তোমরাও ঠিক সেভাবে ইমান আনো, যেভাবে (তোমাদের সামনে) এই লোকেরা ইমান এনেছে, তখন (বড় অহংকারের সাথে) বলে: 'আমরা কি এই নির্বোধদের মতো ইমান আনব?' শুনে রাখো, এরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা জানে না। যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে: 'আমরা মেনে নিয়েছি' এবং যখন একান্তে নিজেদের শয়তানদের কাছে পৌঁছে, তখন বলে: 'আমরা তোমাদের সাথেই আছি, আমরা তো বিদ্রূপ করছিলাম। (তারা কী বিদ্রূপ করবে? বাস্তবতা হচ্ছে এটাই যে), আল্লাহ তাদের সাথে বিদ্রূপ করছেন এবং তাদের অবাধ্যতায় তাদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন, এমনভাবে যে – তারা পথভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরাই তারা, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, ফলে তাদের এই ব্যবসা (তাদের জন্য) সামান্যতম লাভজনক হয়নি এবং তারা সঠিক পথও পায়নি।

দরসে হাদিস

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবিদের সাথে নিয়ে শেবে আবি তালিবে যাওয়া

মুহাম্মদ রফি মুফতি / মহসিন মমতাজ

১

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা মিনায় ছিলাম যখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের বললেন: 'আগামীকাল আমরা খাইফে বনি কেনানায় অবস্থান করব, যেখানে (এককালে) তারা কুফরের ওপর (অটল থাকার) শপথ করেছিল।

এই ঘটনাটি এভাবে ঘটেছিল যে, বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের বিরুদ্ধে কুরাইশ ও বনু কেনানা (এক পর্যায়ে) আপোসে শপথ করে এই চুক্তি করেছিল যে, তারা তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করবে না এবং তাদের সাথে কোনো লেনদেন রাখবে না, যতক্ষণ না তারা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাদের হাতে তুলে দেয়। (রাবি ব্যাখ্যা করে বলেছেন): এই (খাইফে বনি কেনানা) দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মুহাসসাব উপত্যকা।

দরসে হাদিস

১. এটা সেই চুক্তির উল্লেখ, যার অধীনে কুরাইশ ও বনু কেনানা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তার পরিবারের সাথে সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যার ফলে তিন বছর পর্যন্ত এই লোকেরা নিজেদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে চরম সংকটে নিমজ্জিত ছিলেন, এমনকি ক্ষুধা মেটানোর জন্য কোনো কোনো সময় গাছের পাতাও খেতে হয়েছে। সীরাতের কিতাবগুলোতে একে সাধারণত 'শেবে আবি তালিবের বন্দিদশা' হিসেবে অভিহিত করা হয়। বর্ণনা করা হয়েছে, লেখার পর এই চুক্তিটি বাইতুল্লাহয় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে সবাই এ বিষয়ে সতর্ক থাকে এবং তাদের মধ্যে কেউ এটি লঙ্ঘন করার দুঃসাহস না দেখায়। কিন্তু তারপর এমন এক সময় এল যখন 'আল্লাহ' শব্দ ছাড়া এই চুক্তির পুরো লেখাটি উইপোকায় খেয়ে শেষ করে দিল। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই খবর তাঁর চাচা আবু তালিবকে দিলেন, যিনি একে তার ভাতিজার সত্যতার দলিল হিসেবে পেশ করলেন এবং কুরাইশদের অবশেষে এই বিষয়ে আশ্বস্ত করলেন যে তারা যেন এই জুলুম থেকে বিরত থাকে। এর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন: আস-সিরাতুন নববি, ইবনে হিশাম ২/ ৩-১৯।

মূলপাঠের টীকা

১. এই বর্ণনার মূলপাঠ সহিহ মুসলিম, নম্বর ১৩১৪ থেকে নেওয়া হয়েছে। এর বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।

শব্দের সামান্য পার্থক্যসহ এর সমর্থনমূলক বর্ণনা এই উৎসগুলোতে দেখা যেতে পারে: মুসনাদে আহমাদ, নম্বর ৭২৪০, ৭৫৮০, ৮২৭৮, ৮৬৩৫। বুখারি, নম্বর ১৫৯০, ৩৮৮২, ৪২৮৪, ৪২৮৫, ৭৪৭৯। সহিহ মুসলিম, নম্বর ১৩১৪। সুনানে নাসায়ি, নম্বর ৪১৮৮। মুসনাদে আবি ইয়ালা, নম্বর ৬৩৪৯। সহিহ ইবনে খুজাইমা, নম্বর ২৯৮১, ২৯৮২। হজ্জাতুল বিদা, ইবনে হাজম, নম্বর ৩৪৪। আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকি, নম্বর ৩৫৪। সুনানে কুবরা, বায়হাকি, নম্বর ৯৭৩৩। দালায়েলুন নবুওয়াহ, বায়হাকি ৫/ ৯৩।

এই বর্ণনাটি উসামা বিন জায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-ও বর্ণনা করেছেন। তার থেকে এর শাওয়াহিদ এই উৎসগুলোতে উদ্ধৃত হয়েছে: সুনানে ইবনে মাজাহ, নম্বর ২৯৪২। মুসনাদে বাজার, নম্বর ২৫৮২। সহিহ ইবনে খুজাইমা, নম্বর ২৯৮৫। মুস্তাখরাজে আবি আওয়ানা, নম্বর ৫৫৯৬।

জ্ঞান ও যুক্তি-প্রমাণ

জাভেদ আহমেদ গামিদি

মানুষের জন্য তার জ্ঞানের বিষয়বস্তু কেবল দুটি জিনিসই হতে পারে:

এক : নফস (সত্তা) এবং

দুই : পদার্থ।

এরপর এগুলোর বহিঃপ্রকাশ নিয়ে চিন্তা করলে সেগুলোও কেবল দুটি রূপেই প্রকাশিত হয়:

এক : বস্তু এবং

দুই : তাতে শক্তির প্রকাশ।

নাম (বিশেষ্য) ও ক্রিয়ার শব্দগুলো দুনিয়ার সমস্ত ভাষায় এই বাস্তবতাই বর্ণনা করে এবং এই ভিত্তিতেই তাদের ব্যাকরণের ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলো বোঝার জন্য যে সক্ষমতা মানুষকে দান করা হয়েছে, তাকে আমরা বুদ্ধি-বিবেক (আকল) বলি। এটাই মানুষের আসল শ্রেষ্ঠত্ব।নফস ও পদার্থ – উভয় পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য যে মাধ্যমগুলো মানুষের আয়ত্তে আছে, সেগুলোকে ইন্দ্রিয় বলে। বুদ্ধির জন্য এগুলোর মর্যাদা যেন জ্ঞানের প্রবেশদ্বারের মতো। এই ইন্দ্রিয়গুলো যেমন প্রকাশ্য, তেমনি অভ্যন্তরীণও বটে। বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলো মানুষের বুদ্ধিকে পদার্থের সাথে সম্পর্কিত করে এবং অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গুলো নফসের সাথে তার সংযোগ ও সম্পর্কের মাধ্যম হয়ে ওঠে। এর মাধ্যমে যেসব সত্য মানুষের জ্ঞানে আসে, সেগুলোর জন্য কোনো যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, যেন ‘সূর্যই সূর্যের আগমনের দলিল’।

এই কারণে সেগুলোকে ‘অস্তিত্বগত সত্য বা স্বতঃসিদ্ধ সত্য’ হিসেবে অভিহিত করা হয়। মানুষের জ্ঞানের সূচনা এই সত্যগুলোর উপলব্ধির মাধ্যমেই হয়।

এই উপলব্ধি কীভাবে জ্ঞান হয়ে ওঠে, তার ব্যাখ্যা আমরা এই বইয়ের “জ্ঞানের ভিত্তি” শিরোনামের অধীনে করেছি।মানুষের বুদ্ধি যখন এই জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয় এবং এই ‘অস্তিত্বগত সত্য বা স্বতঃসিদ্ধ সত্য’গুলো উপলব্ধি করে, তখন সে জানা বিষয় থেকে অজানা বিষয়ে পৌঁছানোর দিকে যাত্রা শুরু করে।একেই যুক্তি-প্রমাণ (ইস্তিদলাল) বলা হয়। উপলব্ধির পর এটা জ্ঞানের দ্বিতীয় মাধ্যম।

- এই যুক্তি-প্রমাণ যখন মানুষের চেতনার কাঠামাতে বিদ্যমান ‘আবশ্যিক জ্ঞান’-এর বাস্তবতাসমূহকে যুক্তির ভিত্তি বানায়, তখন এর অনিবার্য ফল হিসেবে দ্বিতীয় কিছু সত্য অস্তিত্বে আসে; যেমন – প্রভাব থাকলে প্রভাব বিস্তারকারীও আছে এবং কর্ম থাকলে কর্তাও আছে, অথবা কর্মে যেসব গুণের প্রকাশ ঘটেছে, সেগুলো কর্তার মাঝেও অবশ্যই থাকবে।

- আর যখন কল্পনার ভিত্তিতে [যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগ] করা হয়, তখন তা জ্ঞানের নতুন জগতের সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়।জ্ঞানের সমস্ত অনুমান – চাই তা মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান হোক কিংবা বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান হোক – সবই এখান থেকে সৃষ্টি হয় এবং গ্রহণ-বর্জনের ধাপগুলো অতিক্রম করে।

শুধু তাই নয়, এর অর্জনও অত্যন্ত অসাধারণ।তাই আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের বুদ্ধি যখন নফসের গভীরে প্রবেশ করল, তখন রানি বিলকিসের সিংহাসন চোখের পলকে ইয়েমেন থেকে জেরুজালেমে নিয়ে আসা হলো। আবার এই বুদ্ধিই যখন পদার্থের রহস্যভেদ করে অণুর হৃদয় বিদীর্ণ করতে সফল হলো, তখন আমাদের প্রতিচ্ছবি জীবন্ত অস্তিত্বের রূপ নিয়ে পৌঁছে গেল প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি আসরে।এমনকি আমাদেরই উদ্ভাবিত যন্ত্রসমূহ আজ আমাদের জন্য শিক্ষকের মর্যাদা লাভ করেছে। এসবই আমরা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি; কিন্তু বলা যায় না যে, বিচিত্র রূপের অধিকারিণী এই মানবিক বুদ্ধি ভবিষ্যতে আরও কী কী বিস্ময় উপহার দেবে, যা আজ হোক বা কাল একইভাবে বিশ্বমঞ্চে প্রকাশিত হবে।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, নফস ও পদার্থের এই জগতের বাইরেও এর পৌঁছানোর কোনো সম্ভাবনা আছে।কখনো নয়, এর বিচরণক্ষেত্র এই জগতই; যার সীমানা কুরআন اَقْطَارُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (আকতারুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ – আসমান ও জমিনের প্রান্তসমূহ) শব্দগুলোর মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছে। কাজেই এই সীমানার ওপারে যাবার না আছে উপলব্ধির কোনো সুযোগ, আর না আছে যুক্তির কোনো পথ। নফস ও পদার্থের এই জগতের সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকলে তার জন্য ‘সুলতান’ (বিশেষ অনুমতি) প্রয়োজন; আর তা কেবল মহান আল্লাহর দরবার থেকেই লাভ করা সম্ভব:

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾

“হে জিন ও মানবগোষ্ঠী! তোমরা যদি আসমান ও জমিনের সীমানা ছাড়িয়ে বেরিয়ে যেতে পারো, তবে বেরিয়ে যাও। কিন্তু তোমরা তা পারবে না, এর জন্য প্রয়োজন বিশেষ আদেশের। সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন মহিমা বা শানকে অস্বীকার করবে?”

(কুরআন, সুরা রহমান, ৫৫:৩৩-৩৪)

[২০২৪ খ্রিস্টাব্দ]

খোদাতায়ালার ওপর ইমান

জাভেদ আহমেদ গামিদি

মানুষ সৃষ্টি (মাখলুক)। ধর্মের মূল বক্তব্য এই সত্যের উপলব্ধি থেকেই শুরু হয়। এটা এক অস্তিত্বগত বাস্তবতা, যা আমরা যখন খুশি নিজ চোখে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। আমরা জানি, মানুষের সৃষ্টি কোন ধরনের প্রাণহীন উপাদান দিয়ে হয়। আমাদের খাদ্যের মাধ্যমে এগুলো কোথায় এবং কোন কারখানায় (Factory) যায়। আমরা জানি যে, এগুলোর মধ্যে মানুষের কোনো বীজ থাকে না এবং এমন কোনো জিনিসও থাকে না, যা পদার্থকে জীবনে এবং জীবনকে চেতনায় রূপান্তর করতে পারে। কিন্তু এই খাদ্যই যখন একটি বিশেষ স্থানে পৌঁছায়, তখন তা সেই বীর্যে পরিণত হয়, যার মধ্যে মানুষ হয়ে ওঠার যোগ্যতাসম্পন্ন বীজ বিদ্যমান থাকে। একজন পুরুষের দেহ থেকে একই সময়ে যে পরিমাণ বীর্য নির্গত হয়, তাতে লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি বীজের অস্তিত্ব থাকে। এগুলোর প্রতিটি এই সক্ষমতা রাখে যে, তা যদি নারীর ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় – যা একইভাবে অন্য একটি কারখানায় (Factory) তৈরি হয় – তবে তা পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হতে পারে। আমরা দেখতে পাই যে, বীর্য যখন ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়, তখন শুরুতে যা অস্তিত্ব লাভ করে, তা এতই ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা দুষ্কর। অথচ এই তুচ্ছ বস্তুটিরই বিবর্তন ঘটে; নয় মাস কয়েক দিনের ব্যবধানে এক ফোঁটা পানি থেকে তা রক্তপিণ্ডে, রক্তপিণ্ড থেকে মাংসপিণ্ডে এবং মাংসপিণ্ড থেকে হাড় ও হাড়ের ওপর মাংসের আবরণে সজ্জিত এক সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তায় রূপান্তর লাভ করে মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে।

অতঃপর এই পৃথিবীতে সে তার বিস্ময়কর শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে জ্ঞান-যুক্তি, বুদ্ধি-প্রজ্ঞা এবং শিল্প-কারুশৈলীর এমন সব উৎকর্ষ প্রদর্শন করে, যা আজ জগতের সর্বত্রই দৃশ্যমান।

আমরা এই সৃষ্টিকে দেখি এবং আমাদের চেতনার গঠনের কারণেই আমরা এর স্রষ্টাকে খুঁজতে বাধ্য হই।প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা থাকতে হবে –বিষয়টি এমন নয়, বরং প্রতিটি 'সৃষ্টির' একজন স্রষ্টা থাকতে হবে।এই 'সৃষ্টির কর্ম'-ই আমাদের এই অনুসন্ধানে বাধ্য করে।আমরা এই সহজাত তাড়না নিয়েই জন্মেছি, তাই আমরা কখনোই এতে সন্তুষ্ট হতে পারি না যে – কার্যের জন্য কারণ এবং কর্মের জন্য কর্তার অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকব।দর্শন, বিজ্ঞান এবং সুফিবাদের মহীরুহদের একে একে দেখে নিন, কেউই এ থেকে বিমুখ হতে পারেননি।সুতরাং জ্ঞানের পুরো ইতিহাসই এই বাস্তবতার স্বীকৃতির ইতিহাস যে – প্রতিটি সৃষ্টির একজন স্রষ্টা আছেন; মানুষ সৃষ্টি, অতএব মানুষেরও একজন স্রষ্টা আছেন।

শুধু তাই নয়, আমরা জানি যে, সৃষ্টির যে কর্ম আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি, তা সুচিন্তিত এবং এর প্রতিটি অংশে অসীম ক্ষমতা এবং অনন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটেছে। আমরা যেমন সৃষ্টিকে অস্বীকার করতে পারি না, তেমনি এই কর্মের প্রকৃতিকেও অস্বীকার করতে পারি না।কারণ, এই কর্মের প্রকৃতিও ঠিক তেমনই এক বাস্তবতা, যেমন সৃষ্টির কর্মও একটি বাস্তবতা। আমরা যেভাবে কর্ম পর্যবেক্ষণ করি, ঠিক সেভাবেই এই বাস্তবতাকেও পর্যবেক্ষণ করি।সুতরাং আমরা এ কথা স্বীকার করতেও বাধ্য যে, মানুষের স্রষ্টা ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, তাঁর ক্ষমতা অসীম এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

মানুষের বুদ্ধি তাকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসে। এই সফরে তার বাইরে থেকে কোনো নির্দেশনার প্রয়োজন হয় না।জ্ঞান ও উপলব্ধির যে সক্ষমতা মানুষকে তার জন্মের সাথে দান করা হয়েছে, সেটা-ই এই সফরে পথ দেখানোর জন্য যথেষ্ট।কিন্তু এর পরের প্রশ্ন হলো– সেই স্রষ্টা কে? এই প্রশ্নের উত্তর মানুষের বুদ্ধি এমন অকাট্য নিশ্চয়তা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দিতে পারে না।তাই সে সাধারণত সেই দুটি উত্তরের দিকে তাকায়, যা মানবজাতির পুরো ইতিহাসে এ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি বেছে নেয় অথবা সেগুলোর মাঝে দোদুল্যমান থাকে।

প্রথম উত্তরটি হলো – মানুষ যে মহাবিশ্বের কোলে চেতনার চোখ খোলে, সেই মহাবিশ্বই তার স্রষ্টা।এটা নাস্তিক্যবাদের উত্তর।

এর ব্যাখ্যা সাধারণত এভাবে করা হয় যে, মহাবিশ্বের নিজস্ব চেতনা আছে, ফলে এর অভ্যন্তরেই এমন এক শক্তি বিদ্যমান, যা তার সত্তাগত দিক থেকে 'সৃষ্টিকর্তা'। এর বাইরে আর কিছু নেই, এমনকি ভেতর ও বাইরের পার্থক্যটুকুও এর ভেতরেই সীমাবদ্ধ। মহাবিশ্বের প্রতিটি অংশ একদিকে যেমন তার অভ্যন্তরীণ সত্তা, অন্যদিকে তেমনই তার বাহ্যিক প্রকাশ। এটা কার্যকারণ সম্পর্কের এক বিশাল কারখানা হতে পারে, তবে সামগ্রিক বিচারে এটা নিজেই নিজের চূড়ান্ত কারণ (Ultimate Cause)।

এই উত্তরটি নিছক একটি দাবি মাত্র।

প্রথমত এই কারণে যে, এতে মহাবিশ্বের যে স্ব-চেতনার দাবি করা হয়েছে, তার কোনো প্রমাণ আমাদের পর্যবেক্ষণে কখনো আসেনি। আমরা জানি যে, মহাবিশ্বের মূল সত্তা হলো পদার্থ (Matter), আর পদার্থ ইচ্ছাশক্তিহীন; তা জ্ঞান ও বুদ্ধি থেকেও শূন্য। এই জিনিসগুলো যদি কোনো মাত্রায় কোথাও পাওয়া যায়, তবে তা সেই 'সৃষ্টির' মধ্যেই পাওয়া যায়, যার স্রষ্টা হিসেবে এই মহাবিশ্বকে দাবি করা হয়েছে।শুধু তাই নয়, সেই ক্ষমতাও যদি কোনো স্তরে কোথাও থেকে থাকে, তবে তা সেই সৃষ্টির মধ্যেই আছে; যা ছাড়া জ্ঞান, বুদ্ধি এবং ইচ্ছা – সবই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত এই কারণে যে, মহাবিশ্বের যে শক্তির বহিঃপ্রকাশকে অনেকে 'সৃষ্টি' বলে ভুল করেন, তা আসলে জড় পদার্থের সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র। শক্তির এমন প্রকাশ তো মানুষের তৈরি প্রতিটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কলকব্জাতেও দেখা যায়; যার চরম উৎকর্ষ বর্তমানে 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' (Artificial Intelligence) রূপে আমাদের প্রত্যেককে প্রতিনিয়ত বিস্মিত করছে।

তৃতীয়ত এই কারণে যে, এই মহাবিশ্বের যদি কোনো সামগ্রিক সত্তা থেকেও থাকে, তবে তা সেইসব বস্তুগত প্রভাব ও বৈশিষ্ট্যেরই সমষ্টি, যা কেবল কার্যকারণ সম্পর্কের একটি শৃঙ্খল তৈরি করে।এর সাথে সৃষ্টির সেই মহান কার্যের কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই – যা প্রতিটি পদে পদে জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিপ্রায় এবং সৃজনশীল ক্ষমতার দাবি রাখে। এটা নিছক উপায়-উপকরণ, কর্মপদ্ধতি আর প্রাকৃতিক নিয়মের একটি জগৎ; এর বাইরে এর কোনো স্বতন্ত্র বা অতিপ্রাকৃত মর্যাদা নেই।

মানুষের স্রষ্টা কে? এই প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরটি তারা দিয়েছেন, যারা নিজেদেরকে 'নবী' হিসেবে পেশ করেন। মানুষকে এই উত্তর তার সৃষ্টির সাথেই প্রদান করা হয়েছিল। সুতরাং প্রথম মানুষ যেভাবে প্রথম মানুষ ছিলেন, তেমনি তিনি প্রথম নবীও ছিলেন।এই উত্তরের সারকথা হলো – মানুষের স্রষ্টা এই মহাবিশ্বের ঊর্ধ্বে এক মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় সত্তা।

মানুষের সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল মাটির গভীর থেকে। মাটির সেই উপাদানগুলো – যা বর্তমানে খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং এক বিন্দু তুচ্ছ জলীয় নির্যাস হিসেবে আমাদের মানুষ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটায় – সেগুলো তখন পচা কাদার ভেতরে ঠিক একই ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল।এই প্রক্রিয়াটি ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে, যতক্ষণ না দৈহিক কাঠামোটি পূর্ণতা পায়; আর সে পর্যায়ে কাদাটি উপরিভাগ থেকে শুকিয়ে শক্ত মাটিতে পরিণত হয়। অতঃপর তা বিদীর্ণ হয়ে একটি জ্যান্ত প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে, যা মানুষের প্রাথমিক বা আদিম জৈবিক সত্তারই প্রতিনিধিত্ব করে।

পরবর্তীতে, পৃথিবীর বুকে যে রূপান্তর বা বিবর্তন দেখা গিয়েছিল, তা-ই জ্ঞান ও উপলব্ধিহীন এই অপরিপক্ব প্রাণীটির ভেতরেও সঞ্চারিত হতে শুরু করে। কয়েক প্রজন্মের পারস্পরিক সংমিশ্রণ ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের এই আদি রূপটি ধীরে ধীরে মার্জিত ও সুশোভিত হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের 'ব্যক্তিত্ব' ধারণ করার উপযোগী এক পর্যায়ে পৌঁছায়।পরিশেষে, একটি সূক্ষ্ম ফুৎকারের মাধ্যমে সেই ব্যক্তিত্ব তাকে দান করা হয় – যা আমাদের চেনা মানবজাতির সৃষ্টির চূড়ান্ত ধাপ হিসেবে চিহ্নিত।

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

"মানুষের সৃষ্টির সূচনা তার স্রষ্টা মাটি থেকেই করেছিলেন; অতঃপর তার বংশধারা এক তুচ্ছ তরলের নির্যাস থেকে চলমান রেখেছেন।এরপর তিনি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুঠাম ও সুশোভিত করেছেন এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন।আর তিনি তোমাদের (শোনার জন্য) কান, (দেখার জন্য) চোখ এবং (উপলব্ধির জন্য) অন্তর তৈরি করেছেন; তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"

(কুরআন, সাজদা, ৩২:৭-৯)

এই উত্তরটি সর্বশেষ যে মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে, তা হলো এই কুরআন, যার আয়াতগুলো উপরে উদ্ধৃত হয়েছে।যে নবী এটা পেশ করেছেন, তার দাবি হলো: এটা স্রষ্টার নিজস্ব কালাম, যা তার ওপর নাজিল করা হয়েছে।যেভাবে নাজিল করা হয়েছে, তিনি অবিকল সেভাবেই মানুষকে পড়ে শুনিয়েছেন। এতে একটি অক্ষর বা একটি চিহ্নের পরিবর্তনও তিনি করেননি এবং কিয়ামত পর্যন্ত কেউ তা করার দুঃসাহস দেখাতে পারবে না।

এই দাবি খোদ কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে এবং এর সাথে অত্যন্ত স্পষ্ট একটি মানদণ্ডও সামনে রাখা হয়েছে, যার ভিত্তিতে আমরা ফয়সালা করতে পারি যে – কুরআন কি আসলেই স্রষ্টার কালাম নাকি কোনো মানুষ মিথ্যা রচনা করে একে স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত করেছে?

সেই মানদণ্ড কী? একে আমরা নিম্নোক্ত তিনটি পয়েন্টের আকারে পেশ করতে পারি:

প্রথমত, মানুষ যে জ্ঞানই সৃজন করুক না কেন, শব্দ ও অর্থ – উভয় দিক থেকেই তাকে 'ভুল ও সংশোধন' (Trial and Error)-এর বহু স্তর পার হয়ে আসতে হয়। জন্মের প্রথম দিনেই কেউ সক্রেটিস বা প্লেটো হয়ে যায় না; রাতারাতি কেউ গালিব, শেক্সপিয়র কিংবা নিউটন বা আইনস্টাইন হয়ে ওঠে না।বরং মানুষ শেখে, অনুধাবন করে এবং শেখার প্রতিটি ধাপে ভুল করে আবার তা সংশোধনও করে।আমরা দেখি, মানুষ বছরের পর বছর ধরে তার পূর্বসূরিদের জ্ঞান আহরণ করে, তা নিয়ে নিরন্তর চর্চা ও সাধনা চালায় এবং ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়; অবশেষে তার পক্ষ থেকে জ্ঞান বা সাহিত্যের কোনো কালজয়ী সৃষ্টি আত্মপ্রকাশ করে। এটাই মানুষের চিরায়ত নিয়তি এবং সে এভাবেই সৃজিত হয়েছে।জ্ঞান ও সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে এর কোনো ব্যতিক্রম কখনো দেখা যায়নি এবং ভবিষ্যতেও তেমন কিছু কল্পনা করা যায় না।

তবে কুরআন এই সর্বজনীন নিয়মের এক অনন্য ব্যতিক্রম।এটা যার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেই ব্যক্তি কয়েকশ ঘরের এক ছোট জনপদে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তার জাতির চোখের সামনেই দিন-রাত অতিবাহিত করেছেন।এই দীর্ঘ সময়ে তার প্রতিটি কর্মকাণ্ড ছিল সবার কাছে দৃশ্যমান; অথচ সাধারণ মানুষের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে 'ভুল ও সংশোধনের' যে চিরাচরিত প্রক্রিয়া অনিবার্য, তার মাঝে কখনো তার সামান্যতম চিহ্নও কেউ দেখতে পায়নি।

ফলে, তাদের কাছে এটা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর যে – তাদেরই মাঝে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত (সাদিক ও আমিন) হিসেবে সুপরিচিত একজন মানুষ কীভাবে নিজে থেকে এমন গভীর জ্ঞান ও প্রাঞ্জল বাণীর অধিকারী হতে পারেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারা তখন ধারণা করতে শুরু করল যে, নিশ্চয়ই কোনো শিক্ষিত অনারব ব্যক্তি তাকে এসব তথ্য শিখিয়ে দিচ্ছে। তাদের এই সংশয় ও অপবাদের জবাবে কুরআন নিজেই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে:

قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾

“(আপনি তাদের) বলে দিন – আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে আমি তোমাদের এই কুরআন পড়ে শোনাতাম না এবং আল্লাহও তোমাদের এ বিষয়ে অবহিত করতেন না। এটা সম্পূর্ণ তাঁরই সিদ্ধান্ত; কারণ, আমি তো এর আগে তোমাদের মাঝে জীবনের দীর্ঘ একটি সময় কাটিয়েছি। (আমি কি আগে কখনো এমন কোনো কথা বলেছি?) তবে কি তোমরা সামান্যতম বুদ্ধিও খাটাবে না? সুতরাং সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে? সত্য এই যে, এমন অপরাধীরা কখনোই সফল হতে পারবে না।”

(কুরআন, ইউনুস, ১০: ১৬-১৭)

কথা ছিল এমন যে – হে নির্বোধরা, তোমরা আমাকে কবে এই সব বিষয়ে আগ্রহী হতে দেখেছ, কিংবা এসব বিষয়ে কোনো চিন্তা ও মত প্রকাশ করতে দেখেছ, অথবা এগুলোর বিন্যাস ও সংকলনের জন্য কোনো চর্চা ও সাধনায় নিমগ্ন হতে দেখেছ, কিংবা এ সংক্রান্ত কোনো জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জন করতে দেখেছ – যা এখন কুরআনের সুরাগুলোতে একের পর এক আলোচিত হচ্ছে? পুরো চল্লিশটি বছর আমি তোমাদের মাঝে কাটিয়েছি, আমার কথাবার্তা এবং আমার চলন-বলনের মধ্যে তোমরা কবে এমন কিছু অনুভব করেছ, যা এই দাওয়াতের ভূমিকা বা প্রস্তুতি বলা যেতে পারে? আজ আমি যা বলছি, তার ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের কোনো চিহ্ন কি তোমরা কখনো আমার জীবনে পেয়েছ? তোমরা জানো যে, মানুষের মস্তিষ্ক তার বয়সের কোনো পর্যায়েই এমন কিছু পেশ করতে পারে না, যার ক্রমবিকাশের চিহ্ন তার আগের ধাপগুলোতে বিদ্যমান নেই। তোমরা বলছ যে, আমি আল্লাহর নামে মিথ্যা বলছি। এর আগে কোনো মিথ্যা, প্রতারণা, জালিয়াতি বা ধূর্ততার সামান্যতম রেশও কি কখনো আমার চরিত্র ও স্বভাবে দেখেছ?

আজ পর্যন্ত তোমরা আমাকে সাদিক ও আমিন বলে জেনে এসেছ।এখন কীভাবে বলছ যে, সেই সাদিক ও আমিন রাতারাতি আত্মম্ভরী, চরম মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা রটনাকারী হয়ে গেছে? আল্লাহর বান্দারা, তোমরা কেন বুদ্ধি খাটাও না?

দ্বিতীয়ত, মানুষের জ্ঞান কখনোই স্ববিরোধিতা (Contradictions) থেকে মুক্ত হতে পারে না। "গড়লাম, পূজা করলাম, আবার ভেঙে ফেললাম" – মানুষ প্রথম দিন থেকে যে চিন্তার যাত্রা শুরু করে, শেষ পর্যন্ত সেই ভাঙা-গড়ার গল্পই অব্যাহত থাকে। গভীর চিন্তা করলে দেখা যায়, এটাও মূলত সেই 'ভুল ও সংশোধন' প্রক্রিয়ারই ফল, যার কথা আগে বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষের এই জ্ঞান যখন সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করে, সেখানেও একই চিত্র ফুটে ওঠে। মানুষের সৃজনশীল কর্মগুলোকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে ছন্দ, অলংকার ও অর্থের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান চোখে পড়ে। তার বক্তব্য কোথাও হয়তো অলৌকিক সৌন্দর্যে ভাস্বর হবে, আবার কোথাও হবে অত্যন্ত সাধারণ, এমনকি অসংলগ্ন। বাস্তবতা এই যে, পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষের জন্ম হয়নি, যে বৈচিত্র্যময় বিষয় ও ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে অলঙ্কার ও বাচনভঙ্গির এমন এক উচ্চস্তরে পৌঁছে নিরবচ্ছিন্নভাবে কথা বলে যাবে – যা সংকলিত করলে একটি সুসংগত ও অভিন্ন বাণীসমগ্রের রূপ নেবে; যেখানে চিন্তাধারার কোনো সংঘাত থাকবে না, বক্তার মানসিক অস্থিরতার কোনো ছাপ থাকবে না এবং মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কোনো চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এ ক্ষেত্রেও যদি কোনো ব্যতিক্রম থেকে থাকে, তবে তা একমাত্র কুরআন।এজন্যই বলা হয়েছে:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে তারা এতে অবশ্যই অনেক অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য খুঁজে পেত।"

(কুরআন, সুরা নিসা, ৪:৮২)

উস্তাদ ইমাম [আমিন আহসান ইসলাহি] লিখেছেন:

"... কুরআনের প্রতিটি কথা তার মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখায় এতটাই সুসংহত ও সুবিন্যস্ত যে, গণিত বা ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ফর্মুলাগুলোও অতটা সুসংহত ও সুবিন্যস্ত হতে পারে না। কুরআন যেসব আকিদার শিক্ষা দেয়, সেগুলো একে অপরের সাথে এমনভাবে গাঁথা যে, যদি তার মধ্য থেকে কোনো একটিকেও আলাদা করা হয়, তবে পুরো শৃঙ্খলাটিই ভেঙে পড়বে। কুরআন যেসব ইবাদত ও আনুগত্যের আদেশ দেয়, সেগুলো আকিদা থেকে এমনভাবে উৎসারিত হয়, যেভাবে কান্ড থেকে শাখা-প্রশাখা গজিয়ে ওঠে; এটা যেসব আমল ও নৈতিকতার তাকিদ দেয়, সেগুলো তার মূলনীতি থেকে এমনভাবে প্রকাশিত হয়, যেভাবে কোনো বস্তু থেকে তার প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। কুরআনের সামগ্রিক শিক্ষা থেকে জীবনের যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তা একটি 'বুনইয়ানুম মারসুস' বা সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মূর্ত হয়; যার প্রতিটি ইট অন্যটির সাথে এমনভাবে যুক্ত যে, পুরো ইমারতে শূন্যতা সৃষ্টি না করে তার কোনো একটি ইটকেও আলাদা করা সম্ভব নয়।'

(তাদাব্বুরে কুরআন, ২/৭৪৩)

তৃতীয়ত, কোনো মানুষের জ্ঞান কখনোই পুরোপুরি সত্য হয় না। তার মধ্যে সত্যের সাথে সবসময়ই কিছু না কিছু মিথ্যার মিশ্রণ ঘটে। ফলে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে না নিতেই তার জ্ঞান, তথ্য, গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত, যুক্তি এবং অনুমানের ভুলগুলো স্পষ্ট হতে শুরু করে। সক্রেটিস ও প্লেটো, নিউটন ও আইনস্টাইন – প্রত্যেকের নিয়তি এটাই। এ থেকে কারোর নিস্তার নেই। জ্ঞান ও সাহিত্যের পুরো ইতিহাসে এমন কোনো ব্যক্তিকেও কোনো যুগে বা কোনো স্থানে দেখা যায়নি, যিনি এর ব্যতিক্রম। কিন্তু কুরআন এই ক্ষেত্রেও এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। আজ প্রায় দেড় হাজার বছর হতে চলল এটা নিরন্তর পরীক্ষার সম্মুখীন, কিন্তু বড় থেকে বড় দার্শনিক, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বা বিজ্ঞানীর পক্ষেও সম্ভব হয়নি এর কোনো কথাকে ভুল এবং কোনো শিক্ষাকে মিথ্যা প্রমাণ করা। গত তিন শতাব্দীতে পৃথিবী কোথায় থেকে কোথায় পৌঁছেছে, কিন্তু এই পুরো সফরে এমন কোনো বাস্তবতা উন্মোচিত হয়নি, যা কুরআনের পেশ করা সত্যের পরিপন্থী। কোনো জ্ঞানই কুরআনের বর্ণিত জ্ঞানকে অসার প্রমাণ করতে পারেনি; এমন কোনো পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ আজ পর্যন্ত ঘটেনি, যা কুরআনের দেওয়া কোনো নির্দেশনাকে ভুল প্রমাণ করতে পারে – তা সে যে উদ্দেশ্যেই মানুষকে দেওয়া হোক না কেন। কুরআন যাকে حق (সত্য) বলে, তা কখনো মিথ্যা হয়নি এবং যাকে باطل (মিথ্যা) বলে, তা কখনো সত্য প্রমাণিত হয়নি। কুরআন সম্পর্কে এই সত্যগুলো অনস্বীকার্য। বলা হয়েছে:

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

“হাকিকত হচ্ছে: এটা এক সুউচ্চ মর্যাদার কিতাব।এর সামনে কিংবা পেছন – কোনো দিক থেকেই মিথ্যা বা ভ্রান্তি এতে প্রবেশ করতে পারে না। এটা অত্যন্ত সুনিপুণ ব্যবস্থাপনায় সেই সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি পরম প্রজ্ঞাময় এবং যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী।

(কুরআন, হামিম সাজদা, ৪১: ৪১-৪২)

এটা-ই সেই মানদণ্ড, যার আলোকে নিজের সত্যতা প্রমাণ করার পর কুরআন মানুষকে জানিয়েছে যে – যেই মহাবিশ্বকে তোমরা নিজের স্রষ্টা মনে করার ভুল করছ, সেটাও তাঁরই সৃষ্টি, যিনি তোমাদের স্রষ্টা।তোমরা কি দেখ না যে, এই দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস সৃষ্টির সৌন্দর্যের এক মুজিজাপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ? প্রতিটি জিনিসের মাঝে রয়েছে অগাধ সার্থকতা, অসাধারণ পরিকল্পনা, প্রজ্ঞা, কুশলী ব্যবস্থাপনা, উপযোগিতা এবং বিস্ময়কর নিয়ম-শৃঙ্খলা। এতে রয়েছে চরম সামঞ্জস্য ও গভীর সমন্বয়; রয়েছে অতুলনীয় জ্যামিতিক ও গাণিতিক হিসাব, যার কোনো ব্যাখ্যা এটা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে – এটাকেও সেই মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় সত্তাই সৃষ্টি করেছেন, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।তিনিই সেই সত্তা, যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য দোলনা এবং পাহাড়গুলোকে তার পেরেক বানিয়ে দিয়েছেন; তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের ঘুমকে বিশ্রামের মাধ্যম এবং রাতকে আবরণ ও দিনকে জীবিকা অন্বেষণের সময় বানিয়েছেন; তোমাদের ওপর সাতটি সুদৃঢ় আকাশ নির্মাণ করেছেন এবং সেগুলোর মধ্যে একটি প্রজ্বলিত প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন।তিনিই সে সত্তা, যিনি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে শস্য, উদ্ভিদ ও ঘন বাগান উৎপন্ন করেন:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

“তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছুর পরিজ্ঞাতা। তিনি পরম করুণাময়, তাঁর মমতা চিরন্তন। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি অধিপতি, পরম পবিত্র সত্তা, শান্তি ও নিরাপত্তার আধার, রক্ষক, পরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপান্বিত এবং শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তারা যাদের শরিক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।তিনিই আল্লাহ – যিনি পরিকল্পনাকারী, অস্তিত্বদানকারী ও রূপকার; সকল সুন্দর নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে; আর তিনি পরম শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময়।”

(কুরআন, সুরা হাশর, ৫৯: ২২-২৪)

কুরআন জানিয়েছে যে, এই স্রষ্টার রুবুবিয়্যত বা প্রভুত্বের স্বীকৃতি এমন এক বিষয়, যা সৃষ্টির সূচনা থেকেই মানুষের ফিতরাতের ভেতরে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এর প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল এক অঙ্গীকার ও চুক্তির মাধ্যমে। এই অঙ্গীকারের কথা কুরআন একটি বাস্তব ঘটনারূপে বর্ণনা করে। মানুষকে এখানে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে, তাই এই ঘটনাটি তার স্মৃতি থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এর হাকিকত বা বাস্তবতা তার হৃদয়ের পটে অঙ্কিত এবং মস্তিকের গহীনে প্রোথিত রয়েছে – কোনো কিছুই একে মুছে ফেলতে পারে না। ফলে পরিবেশগত কোনো কিছু যদি অন্তরায় না হয় এবং মানুষকে এটা মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে এর দিকে সেভাবেই ছুটে যায়, যেভাবে একটি শিশু তার মায়ের দিকে ছুটে; অথচ সে নিজেকে কখনো মায়ের পেট থেকে বের হতে দেখেনি।সে এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথেই ছুটে যায় যেন সে আগে থেকেই তাকে চিনত।সে অনুভব করে যে, স্রষ্টার এই স্বীকৃতি তার ভেতরের একটি স্বভাবজাত প্রয়োজনেরই উত্তর, যা তার মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। যখন সে এটা পেয়ে যায়, তখন তার মনস্তত্ত্বের সকল দাবিও এর সাথেই নিজ নিজ স্থান খুঁজে পায়। কুরআনের বক্তব্য হলো – মানুষের অন্তরের এই সাক্ষ্য এতটাই অকাট্য যে, আল্লাহর রুবুবিয়্যত বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তি কেবল এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে বাধ্য।কুরআনে বলা হয়েছে:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

“তাদের সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে দিন, যখন আপনার প্রতিপালক বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদের নিজেদের ওপরই তাদের সাক্ষী রাখলেন। (তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন): ‘আমি কি তোমাদের রব নই?’ তারা উত্তর দিয়েছিল: ‘হ্যাঁ, (আপনিই আমাদের রব), আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি। এটা এ কারণে করা হয়েছে, যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পারো যে, ‘আমরা তো এ বিষয়ে একেবারেই বেখবর ছিলাম। অথবা এই অজুহাত পেশ করতে না পারো যে, ‘শিরক বা অংশীদারিত্বের শুরু তো আমাদের বাপ-দাদারা আগে থেকেই করে রেখেছিল, আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর মাত্র। তবে কি আপনি সেই পথভ্রষ্টদের কর্মের কারণে আমাদের ধ্বংস করবেন?’ আমি এভাবেই আমার আয়াতগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করি, যাতে মানুষের ওপর দলিল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা যেন ফিরে আসে।’

(কুরআন, সুরা আরাফ, ৭: ১৭২-১৭৪)

এই স্বীকৃতিই মহাবিশ্বের প্রাণ।মানুষের বুদ্ধি এতেই প্রশান্ত হয় এবং তার হৃদয় এতেই নুরের উদয়স্থলে পরিণত হয়।ফলে সে চিৎকার করে বলে ওঠে – নিঃসন্দেহে আল্লাহই সেই সত্তা, যাঁর নুরে এই আকাশ ও পৃথিবী আলোকিত:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“আল্লাহ আসমান ও জমিনের জ্যোতি।(মানুষের অন্তরে) এই জ্যোতির উদাহরণ একটি তাকের মতো, যার মধ্যে রয়েছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি রয়েছে একটি কাঁচের আবরণের ভেতরে। সেই কাঁচটি দেখতে যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। সেই প্রদীপটি জলপাইয়ের এমন এক বরকতময় বৃক্ষের তেল দিয়ে জ্বালানো হয়, যা না পূর্বদিকের, না পশ্চিমদিকের।তার তেল (এতটাই স্বচ্ছ যে), মনে হয় আগুন স্পর্শ করার আগেই তা দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে। জ্যোতির ওপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর এই জ্যোতির দিকে পথপ্রদর্শন করেন।আল্লাহ মানুষের (বোঝার) জন্য এসব উপমা বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে অবগত।”

(কুরআন, সুরা নুর, ২৪:৩৫)

উস্তাদ ইমাম লিখেন:

“... এই আকাশ ও পৃথিবী, বরং এই পুরো মহাবিশ্ব সেই ব্যক্তির জন্য এক অন্ধকার জগৎ এবং এক অন্ধকারপুরী, যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না কিংবা বিশ্বাস করলেও আল্লাহর গুণাবলি ও সেগুলোর দাবিকে স্বীকার করে না। এমন ব্যক্তি না এটি জানতে পারে যে, দুনিয়া কোথা থেকে এসেছে, না এটা জানতে পারে যে, এর অস্তিত্বে আসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী? সে নিজের সম্পর্কেও এই ফয়সালা করতে পারে না যে, তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কী? সে এই দুনিয়ায় লাগামহীন ও যা খুশি করার অধিকারী নাকি কোনো বিধানের অনুগত ও আজ্ঞাবহ? সে জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নাকি ঊর্ধ্বে নয়? তার জন্য কোনটি কল্যাণ আর কোনটি অকল্যাণ? তাকে কি জুলুমের পথ অবলম্বন করতে হবে নাকি ন্যায়ের? তাকে কি কেবল নিজের স্বার্থ ও কামনা-বাসনার অনুসরণ করতে হবে নাকি সেগুলোর চেয়ে কোনো উচ্চতর লক্ষ্যের অনুসরণ করতে হবে? এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরের ওপরই সঠিক ও সফল জীবন নির্ভর করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, সে এই প্রশ্নগুলোর সঠিক সমাধান পেতে পারে না। সে অন্ধকারের মাঝে অন্ধ মহিষের মতো পথ হাতড়ে বেড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হয়ে নিজের কর্মফল ভোগ করে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে তাঁর সঠিক গুণাবলির সাথে বিশ্বাস করে, সে এই মহাবিশ্বের আদি উৎসও খুঁজে পায় এবং এর পরিণামও তার কাছে স্পষ্ট। তার কাছে সেই সব প্রশ্নের উত্তরও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যা আল্লাহর অবিশ্বাসী ব্যক্তি কখনো সমাধান করতে পারে না। এই কারণে এ দুনিয়া তার জন্য অন্ধকারপুরী থাকে না, বরং ইমানের নুরে তার জন্য প্রতিটি জিনিস ঝলমল করে ওঠে এবং এর প্রতিটি দিক তার কাছে উজ্জ্বল হয়। সে যে পদক্ষেপই ফেলে, পূর্ণ দিনের আলোতে ফেলে এবং যে দিকেই সে চলে, আল্লাহর ওপর ইমানের নুর তাকে পথ দেখায়। এই বাস্তবতাটি-ই এই আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আকাশ ও জমিনের নুর হলেন আল্লাহ। যাঁর কাছে এই নুর আছে, তিনি আলোতে এবং সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর আছেন। আর যে এই নুর থেকে বঞ্চিত, সে এক অন্ধকার জগতে পথ হারিয়েছে এবং অন্য কেউ তাকে আলো দিতে পারে না – وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ (আল্লাহ যাকে নুর দেন না, তার জন্য কোনো নুর নেই)।”

(তাদাব্বুরে কুরআন, ৫/৪০৯)

[২০২৫ খ্রিস্টাব্দ]

রিসালাতের বিশেষ আইন

মইজ আমজাদ

ইবনে কাসির (রহ.) তার ‘আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া’ গ্রন্থে হাতিব ইবনে আবি বালতাআ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে মিশরের রাজা মুকাওকিসের একটি সাক্ষাৎকারের ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

হাতিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, “রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে একটি পত্র দিয়ে মিশরের রাজা মুকাওকিসের কাছে পাঠান। আমি যখন সেখানে পৌঁছাই, তখন রাজা আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং আমাকে তার আতিথ্য গ্রহণ করতে বলেন।তিনি তার সেনাপতিদের সমবেত করে আমাকে সেখানে ডাকেন।

এরপর রাজা মুকাওকিস বললেন: আমি আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।আমার অনুরোধ, আপনি মনোযোগ দিয়ে আমার কথাটি শুনবেন।হাতিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু): জি, বলুন।রাজা মুকাওকিস: আপনার সেই সঙ্গী, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) – তার সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। তিনি কি আল্লাহর নবী? হাতিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু): তিনি শুধু নবী নন, বরং আল্লাহর প্রেরিত একজন রাসুল।রাজা মুকাওকিস: যদি সত্যিই তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল হন, তবে তার জাতি যখন তাকে নিজ শহর মক্কা থেকে বের করে দিল, তখন তিনি কেন তাদের জন্য আল্লাহর শাস্তি কামনা করলেন না? হাতিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু): আপনি কি ইসা (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহর রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করেন না?

রাজা মুকাওকিস: অবশ্যই বিশ্বাস করি। হাতিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু): তাহলে বলুন তো, যখন তার জাতি তাকে ঘেরাও করেছিল, তাকে ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল এবং এরপর আল্লাহ তাকে আকাশে তুলে নিলেন – তখন তিনি কেন দোয়া করেননি যে, তার প্রতিপালক যেন বনি ইসরাইলকে ধ্বংস করে দেন? রাজা মুকাওকিস: আপনি একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি, আর আপনি এসেছেন একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির কাছ থেকে। আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য এই উপহারগুলো আপনাকে দিচ্ছি।আমার এই প্রহরীরা আপনাকে আপনার শহরের সীমান্তে নিরাপদে পৌঁছে দেবে। এখানে লক্ষ্য করুন, হাতিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন, "তিনি শুধু নবী নন, বরং আল্লাহর প্রেরিত রাসুল" – এই কথাটি প্রমাণ করে যে, রিসালাত মূলত নবুয়তের চেয়ে এক ধাপ উপরের মর্যাদা।

নবী ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে যদিও মতভেদ রয়েছে, তবে কুরআন থেকে এতটুকু পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, এই দুটি পরিভাষা এক নয়; বরং তাদের তাৎপর্য ও প্রয়োগ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ বলেছেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"(হে নবী), আমি আপনার পূর্বে যত রাসুল বা নবী পাঠিয়েছিলাম সবাই এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন যে, যখনই তিনি কোনো আকাঙ্ক্ষা করেন, তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে।অতঃপর আল্লাহ শয়তানের বাধা দূর করেন, এরপর তাঁর আয়াতসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।"

(কুরআন, সুরা হজ্জ, ২২:৫২)

এই আয়াত থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় যে, নবী ও রাসুল মূলত ভিন্ন দুটি পরিভাষা।ইমাম যামাখশারি (রহ.) এই আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন: دليل بين على تغاير الرسول والنبى অর্থাৎ, এই শব্দগুলো নবী ও রাসুলের পার্থক্যের ওপর একটি সুস্পষ্ট দলিল (আল-কাশশাফ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬৪)।

নবী ও রাসুলের এই পার্থক্য আসলে তাদের দায়িত্বের ধরন এবং তাদের সম্পর্কে আল্লাহর সুন্নাত বা বিধানের পার্থক্যের ওপর নির্ভরশীল।

নবী ও রাসুলের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. একজন নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করেন। তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা বা তাকে অস্বীকার করা – মানুষের ইমান ও কুফরের মানদণ্ড। সেই কারণে, তার ক্ষেত্রে আল্লাহ বিশেষভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যে, তিনি তার পূর্ববর্তী নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা রূপে আগমন করেন।

পক্ষান্তরে, একজন রাসুলের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা আরও বিস্তৃত হয়ে ওঠে। রাসুলের আগমনের পূর্বে কেবল একজন নবী নয়, নবীদের একটি দল তাদের জাতিকে ধর্মের দাওয়াতের পাশাপাশি সেই ভবিষ্যতে আগত রাসুলের আগমনের সংবাদও দেন এবং তার ওপর ইমান আনা ও তার সাহায্যে এগিয়ে আসার অঙ্গীকারও গ্রহণ করেন। একজন রাসুলের জন্মস্থান, তার আগমনের সময় ও পরিপ্রেক্ষিত – সবকিছু সম্পর্কেই পূর্ব থেকে সংবাদ দেওয়া থাকে। যখন তিনি পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন তিনি স্পষ্ট ভাষায় তার জাতিকে বলেন, "আমি সেই ব্যক্তি, যার জন্য তোমরা প্রতীক্ষা করছিলে।" তিনি ঘোষণা দেন, "তোমাদের গ্রন্থে ও পূর্ববর্তী নবীদের বাণীতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, আমিই তার বাস্তব প্রতিফলন।"

২. আল্লাহ তাঁর রাসুলকে এতটা দৃঢ় ও স্পষ্ট নিদর্শনসহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন যে, মানুষের কাছে তিনি সত্যের প্রমাণ হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ কোনো জাতির মধ্যে যখন একজন রাসুল আসেন, তখন তার ব্যক্তিত্বই সেই জাতির জন্য সত্যের প্রমাণ (হুজ্জাত) হয়ে ওঠে। এইভাবে সেই জাতির জন্য সত্য ও মিথ্যার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য স্থাপিত হয় এবং তাদের কাছে সত্যের পথ থেকে সরে যাওয়া বা বাতিলকে বেছে নেওয়ার কোনো যথাযথ বাহানা থাকে না। অন্য কথায়, রাসুলদের প্রতি এই অস্বাভাবিক তদারকির ফলশ্রুতিতে তারা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেন। কোনো চিন্তাশীল মানুষের পক্ষে যুক্তি বা প্রমাণের ভিত্তিতে তাদেরকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

৩. রাসুলের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিশেষ বিধান হলো, যদি তার জাতি তাকে অস্বীকার করে, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই জাতির ওপর আজাব নেমে আসে। কিন্তু এটা নবীদের ক্ষেত্রে ঘটে না। নবীদের জাতি তাদেরকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল এবং কখনো কখনো সেই পরিকল্পনা সফলও হয়েছে; কিন্তু রাসুলের ব্যাপারে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাকে অস্বীকারকারী জাতি কোনো অবস্থাতেই তার ওপর প্রাধান্য বা জয় লাভ করতে পারে না।

৪. রিসালাতের এই বিশেষ বিধানের একটি অনিবার্য ফলাফল হলো, যখন কোনো জাতির প্রতি আল্লাহ নিজের রাসুলের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রমাণ (হুজ্জাত) প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি উক্ত রাসুলকে সেই জাতির ওপর বিজয় ও প্রাধান্য দান করেন। তবে এক্ষেত্রে নবী তার জাতির সাথে মুখোমুখি সংগ্রামে পরাজিতও হতে পারেন; কিন্তু রাসুলের জন্য বিজয় অবশ্যই নির্ধারিত।এই বিজয় মূলত দুটি রূপে হতে পারে: কখনো রাসুল নিজ জীবদ্দশাতেই সেই বিজয় লাভ করেন; আবার কখনো রাসুল দুনিয়া থেকে প্রস্থানের পর তাঁর সাহাবিগণ সেই বিজয়ের সম্মান লাভ করেন।

৫. যখন কোনো জাতির মধ্যে আল্লাহ নিজের একজন রাসুল প্রেরণ করেন, তখন সেই জাতি মূলত আল্লাহর শাস্তির দ্বারপ্রান্তে চলে আসে। কারণ, রাসুলের মাধ্যমে সত্য স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করার পরও যদি সেই জাতি জেদ, অহংকার ও গোঁড়ামির কারণে অবিশ্বাস ও অস্বীকারের ওপর অটল থাকে, তবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তারা আর ক্ষমার যোগ্য থাকে না।বরং একটি জাতি হিসেবে তারা তখন আল্লাহর শাস্তি ভোগেরই উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

৬. এটা আল্লাহর বিশেষ বিধান, যা তাঁর রাসুলের জন্য নির্দিষ্ট।আর এই বিধানই নবী ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, এটা আল্লাহর সেই চিরন্তন নীতি, যা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং যা পরিবর্তন বা রদবদল করা সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআন বুঝতে হলে এবং কুরআনের মধ্য থেকে আল্লাহর শরিয়ত নির্ধারণ করতে হলে আমাদের অবশ্যই আল্লাহর এই বিশেষ বিধান সম্পর্কে অবগত হতে হবে। আল্লাহর এই বিশেষ বিধান না বোঝার কারণে মুসলমানদের মধ্যে অনেক মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। এমনকি ইসলামের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর উদ্ভব মূলত এই বিধানকে না বোঝার কারণেই হয়েছে।এছাড়াও মুসলমানেরা এই বিশেষ বিধান না বোঝার কারণে ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যবিদগণ ইসলামের সমালোচনা করার একটি বিশেষ সুযোগ পেয়ে যান।তারা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেও ভুল করেন না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সুরা আল-বাকারার ২৫৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, “লা ইকরাহা ফিদ দীন”, অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। কিন্তু অন্যদিকে, সুরা তওবার ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“এরপর যখন হারাম মাসগুলো অতিবাহিত হবে, তখন এই মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা করো, (এ উদ্দেশ্যে) তাদেরকে পাকড়াও করো, অবরোধ করো এবং প্রত্যেক অতর্কিত হামলার স্থানে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে বসো। অতঃপর যদি তারা তওবা করে, নামাজের যত্ন নেয় এবং জাকাত প্রদান করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, চির দয়ালু।”

(কুরআন, সুরা তওবা, ৯:৫)

স্বাভাবিকভাবে মনে হবে যে, উপরোক্ত দুটি নির্দেশ যেন একে অপরের পরিপূর্ণ বিপরীত। একদিকে ঘোষণা করা হয়েছে, ধর্মের ব্যাপারে কোনো রকম জোরজবরদস্তি নেই; অন্যদিকে বলা হয়েছে, যতক্ষণ না মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের রেহাই দেওয়া যাবে না। উল্লেখ্য যে, কুরআন নিজেই নিজের সম্পর্কে ঘোষণা করেছে যে, এটা মানুষের রচিত গ্রন্থের মতো নয়; বরং এটা সব ধরনের মতবিরোধ ও বৈপরীত্য থেকে মুক্ত। সুতরাং, যদি কেউ কুরআনের আয়াতগুলোর মধ্যে এই ধরনের কোনো বিরোধ বা অসংগতি খুঁজে পায়, তবে কুরআনের নিজের বক্তব্য অনুযায়ী সেটা প্রমাণ করবে যে, এই গ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল নয় (নাউজুবিল্লাহ)।

কোনো সন্দেহ নেই যে, যারা আল্লাহর বিশেষ বিধান সম্পর্কে অবগত নয়, তাদের জন্য কুরআনের এই দুটি আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন। কিন্তু যখন কেউ আল্লাহর সেই ঐশী বিধানকে সামনে রেখে এই আয়াত দুটি বিবেচনা করবে, তখন তার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, একটি আয়াতে মানুষের জন্য সত্য ও মিথ্যা বেছে নেওয়ার সাধারণ নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, আর অপর আয়াতে আল্লাহর একজন রাসুলকে অস্বীকারকারীদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। সুরা তওবার সেই আয়াত মূলত মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছে। তারা যখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অস্বীকার করেছিল, তখন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তারা পৃথিবীতে জীবিত থাকার অধিকারই হারিয়ে ফেলেছিল। তাই সেই আয়াতে আল্লাহ মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন, এই মুশরিকদের এ ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইমান না আনে।

উপরে আমি বলেছি যে, এই নীতি না বোঝার ফলেই ইসলামের বিপ্লবী দার্শনিক তত্ত্ব জন্ম নিয়েছে। যে আয়াতগুলো সম্পূর্ণভাবে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, তা সমগ্র উম্মতের জন্য ফরজ মনে করার ফলেই এমনটা হয়েছে। পরবর্তীতে মুসলমানদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম ইসলামের দাওয়াহ থেকে চ্যুত হয়ে গিয়েছে। আর এই অপূরণীয় ক্ষতির দায় ধর্মীয় আলেমদের ওপর বর্তায়। কেননা আলেমদের প্রধান কাজ হলো নিজের জাতিকে সংশোধন করা, কিন্তু বর্তমানে তারা জাতির নেতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের মূল লক্ষ্য হলো আখিরাতের জীবন সুন্দর করার জন্য মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া। ক্ষমতার চর্চা করা কুরআনের মূল উদ্দেশ্য নয়। কুরআন চায়, পৃথিবীতে যার ওপর যতটুকু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে সে ততটুকু দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করুক; যাতে মৃত্যুর পর সে যখন আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ যেন তার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন।

কুরআনের দৃষ্টিতে এটাই মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য স্মরণ করানোই আলেমদের দায়িত্ব। কিন্তু এই লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে যদি বিপ্লব ও সংগ্রামের দার্শনিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়, তবে ইসলামের প্রকৃতি শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আরও দুঃখজনক বিষয় হলো, এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসের এমন এক সময়ে সামনে এসেছে, যখন মুসলমানরা তাদের শক্তি ও প্রাচুর্য হারিয়ে ফেলেছিল। ফলস্বরূপ, এই দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানদের মধ্যে এক প্রকার আবেগ সৃষ্টি করেছিল এবং খুব দ্রুত পুরো উম্মতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ এ বিষয়ে লক্ষ্য করেনি যে, এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি হিসেবে কুরআনের যে সকল আয়াতকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর কোনো সম্পর্কই আসলে এই ধরনের সংগ্রাম বা বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের সঙ্গে নেই।

এই আয়াতগুলো মূলত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জাতির জন্য নির্দিষ্ট ছিল। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জাতির ওপর আল্লাহর বিশেষ বিধান কার্যকর করেছেন। আর এটাই মূলত রিসালাতের বিশেষ আইন। আল্লাহর এই বিশেষ বিধানের আলোকেই তিনি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, আরব ভূখণ্ডে আল্লাহ মুসলিমদের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন। এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তার সাহাবিদের জন্য একটি পুরস্কার। সমগ্র মুসলমানদের জন্য এই বিধান জরুরি নয়।

ইলমে কালামের ওপর গ্রিক দর্শনের প্রভাব

মুহাম্মদ হাসান ইলিয়াস

ইলমে কালামের বিবর্তন এবং প্রভাব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর ভিত্তি কেবল ইসলামি শাস্ত্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর গড়ে ওঠেনি; বরং এটা গ্রিক দর্শনের দ্বারাও গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল। আল্লামা ইকবাল, শিবলি নুমানি এবং জাভেদ আহমেদ গামিদি-এর মতে, ইলমে কালাম গ্রিক দর্শনের প্রভাবে কুরআনের সহজ ও সহজাত প্রকৃতির ওপর ভিত্তিশীল শিক্ষা থেকে দূরে সরে একটি জটিল বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোতে রূপ নিয়েছে।এই পরিবর্তনের ফলে ইলমে কালামের চিন্তাধারায় এমন এক মাত্রা যুক্ত হয়েছে, যা আসমানি গ্রন্থের চিরাচরিত পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শিবলী নুমানির মতে, মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক বা মুতাকাল্লিমগণ যখন গ্রিক দর্শনের মূলনীতিগুলো গ্রহণ করতে শুরু করেন, তখন তাদের আলোচনা ধীরে ধীরে কুরআনের স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হতে থাকে এবং বিমূর্ত যুক্তি ও তাত্ত্বিক পরিভাষা সেখানে প্রধান হয়ে ওঠে।তিনি আরও বলেন, ধর্মতাত্ত্ববিদরা নিজেদের বিশ্বাস রক্ষার জন্য গ্রিক তর্কবিদ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন, যার ফলে ধর্মীয় বিতর্ক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে দর্শনের জটিল মারপ্যাঁচে আটকে পড়ে।

আল্লামা ইকবালও এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ছিলেন। তার মতে, ইলমে কালাম ইসলামি চিন্তাধারাকে উল্টে দিয়েছে এবং সেটাকে এমন এক যুক্তিকাঠামোর মধ্যে বন্দী করে ফেলেছে, যেখানে যুক্তি ও দর্শনই হয়ে উঠেছে প্রধান মানদণ্ড। তিনি মনে করতেন, ইসলামি বিশ্বাসকে যুক্তি ও দর্শনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করার ফলে ধর্মের প্রকৃত বাণী উপেক্ষিত হয়েছে; আর ইলমে কালামের জটিলতাগুলো ধর্মের সহজ সত্যকে জড়িয়ে ফেলেছে নানাবিধ অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে। ফলে ধর্ম তার সহজাত প্রকৃতি এবং আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কারণ এটা যুক্তি ও তর্কের এমন এক ছাঁচে আটকা পড়েছে, যা মানুষের চেতনার অভ্যন্তরীণ প্রবাহের সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। জাভেদ আহমেদ গামিদি-ও এই মতামতকে সমর্থন করেন। তিনি মনে করেন, মুসলমানরা যখন গ্রিক দর্শন, খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব এবং জরথুস্ত্রীয় চিন্তাধারার আদর্শিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, তখন তারা প্রতিপক্ষের সেই সব তর্কমূলক নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে। এর ফলে ইসলামি বিশ্বাসের মধ্যে এমন সব বিমূর্তায়ন ঢুকে পড়ে, যা ধর্মের মূল বাণীর প্রমাণ ও যুক্তিপদ্ধতিকে তার নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামো থেকে বিচ্যুত করে।

পক্ষান্তরে, উপরে উল্লিখিত এই দৃষ্টিভঙ্গির যারা সমালোচনা করে, তাদের দাবি হলো: ইলমে কালামের শিকড় সম্পূর্ণভাবে ইসলামি উৎসের মধ্যে প্রোথিত। তাদের মতে, কোনো বিদেশি দর্শনের প্রভাবে নয়, বরং মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিশ্বাসগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে গিয়েই এর বিবর্তন ঘটেছে।

তাদের যুক্তি হলো, আল্লাহতায়ালার গুণাবলি, তাকদির ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা কিংবা ইমান ও আমলের পারস্পরিক সম্পর্কের মতো বিষয়গুলো ইসলামি শাস্ত্রের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। তারা এই দাবি মানতে নারাজ যে, ইসলামি ধর্মতাত্ত্ববিদগণ গ্রিক দর্শন গ্রহণ করেছিলেন। তাদের প্রশ্ন হলো, যদি তা-ই হতো, তবে ইমাম আশআরি এবং ইমাম মাতুরিদির মতো মনীষীদের চিন্তাধারা গ্রিক দর্শনের সাথে মুসলমানদের পরিচিত হওয়ার আগেই কীভাবে বিকশিত হলো?

সমালোচকরা আরও বলেন, আবু হাশিম আল-জুব্বাইয়ের মতো পণ্ডিতদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা গ্রিক দর্শনের ফল ছিল না; বরং তা ছিল নিছক ইসলামি শাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অভ্যন্তরীণ বিতর্কের ফসল। তাদের দৃষ্টিতে, ইলমে কালামের উদ্ভব হয়েছিল ইমান রক্ষার তাগিদে।

এর মূল চালিকাশক্তি গ্রিক দর্শন ছিল না, বরং কুরআনের শিক্ষা এবং প্রাথমিক যুগের মুসলিম ফিরকার মধ্যকার আদর্শিক মতভেদ ছিল এর মূল চালিকাশক্তি।

তবে ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ এই দাবিকে সমর্থন করে না। আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে (১৭০-১৯৩ হিজরি) বাইতুল হিকমা প্রতিষ্ঠা এবং আরবি ভাষায় গ্রিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহের অনুবাদ ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। এটা ইসলামি চিন্তাধারাকে নতুন এক বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই অনুবাদগুলো কেবল ইলমে কালামের যুক্তিপদ্ধতিকেই বদলে দেয়নি, বরং এর আদর্শিক অভিমুখকেও প্রভাবিত করেছিল। এই প্রক্রিয়ার ফলেই মুসলিম আলেমরা তাদের বিতর্কে গ্রিক দর্শনের মূলনীতিগুলো গ্রহণ করতে শুরু করেন এবং ইসলামি জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে বিমূর্ত ও যৌক্তিক আলোচনাগুলো উত্তরোত্তর প্রধান হয়ে ওঠে।

আল-কিন্দি (১৮৫-২৫৬ হিজরি)-কে ইসলামি দর্শনের আদি চিন্তাবিদদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয়।তিনি অ্যারিস্টটলীয় এবং নব্য-প্লেটোবাদী দর্শনের সাথে ইসলামি বিশ্বাসের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। তার রচিত 'আল-ফালসাফা আল-উলা' গ্রন্থে আল্লাহর অস্তিত্বের সপক্ষে এমন সব যুক্তি দেওয়া হয়েছে, যেখানে নব্য-প্লেটোবাদের 'পরম সত্তা' (Absolute One)-র ধারণার প্রভাব স্পষ্ট।এই প্রবণতা পরবর্তীকালে আল-ফারাবি (৩৩৯ হিজরি) এবং ইবনে সিনার (৪২৯ হিজরি) মতো দার্শনিকদের কাজে আরও প্রকট হয়ে ওঠে, যারা দার্শনিক মূলনীতির আলোকে ইসলামি বিশ্বাসগুলোকে উপস্থাপনের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন।

আব্বাসি খিলাফতের আমলে, বিশেষ করে খলিফা আল-মামুনের শাসনামলে (১৯৮-২১৮ হিজরি), বাইতুল হিকমার মাধ্যমে গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞানের এক বিশাল অনুবাদ কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। এই অনুবাদ আন্দোলনের মাধ্যমেই অ্যারিস্টটল, প্লেটো, গ্যালেন এবং টলেমির মতো প্রথিতযশা গ্রিক চিন্তাবিদদের গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক কাজগুলো আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। হানাইন ইবনে ইসহাক (২৬০ হিজরি), ইয়াহিয়া ইবনে আদি (৩৬৩ হিজরি) এবং আবু বিশর মাত্তা ইবনে ইউনুসের (৩২৯ হিজরি) মতো অনুবাদকগণ গ্রিক দর্শনকে ইসলামি জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের সাথে একীভূত করেন। এর ফলে পরবর্তী সময়ে ইলমে কালামের আলোচনাগুলো সম্পূর্ণ নতুন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামো লাভ করে।

তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

গ্রিক দর্শনে সুপণ্ডিত নেস্টোরিয়ান খ্রিষ্টীয় চিন্তাবিদগণ ইসলামি খিলাফতের বিভিন্ন কর্মতৎপরতায় যুক্ত হয়ে গ্রিক দর্শনকে আরবিতে রূপান্তর করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। একই সময়ে জ্যাকোবাইটরা নব্য-প্লেটোবাদী ধারণাগুলো প্রচার করতে শুরু করে; অন্যদিকে জরথুস্ত্রীয় পণ্ডিতরা ইসলামি তাকদির বা নিয়তিবাদের বিপরীতে তাদের নিজস্ব 'আলো ও অন্ধকার'-এর দর্শন উপস্থাপন করেন।

এসব আদর্শিক চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় ইলমে কালামের পণ্ডিতরা গ্রিক দর্শনের মূলনীতিগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। কারণ খ্রিষ্টীয় ও জরথুস্ত্রীয় দার্শনিকদের সাথে বিতর্কের ক্ষেত্রে কেবল প্রথাগত বা গতানুগতিক যুক্তি তখন যথেষ্ট ছিল না।গ্রিক দর্শনের এই যৌক্তিক ও যুক্তিবাদী পদ্ধতি মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের এমন এক মজবুত তাত্ত্বিক ভিত্তি দান করে, যার সাহায্যে তারা নিজ নিজ বিশ্বাসকে আরও জোরালোভাবে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।এভাবেই ইসলামি ধর্মতত্ত্বের প্রধান প্রধান ধারা – যেমন মুতাজিলা, আশআরি এবং মাতুরিদিদের মতাদর্শে গ্রিক দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ, মুতাজিলা সম্প্রদায় মানুষের স্বাধীন কর্ম ও ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিল, যা অ্যারিস্টটলের 'কার্যকারণ শৃঙ্খল' (causal chain) নীতির বেশ কাছাকাছি। তাদের মতামত ছিল – মানুষ নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা এবং সেই কর্মের পরিণামের জন্য সে নিজেই দায়ী। এই তত্ত্বটি কেবল খ্রিষ্টীয় ও জরথুস্ত্রীয় চ্যালেঞ্জেরই জবাব দেয়নি, বরং ইসলামি দার্শনিক ঐতিহ্যের সপক্ষে এক ধরনের যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি তৈরিরও প্রয়াস চালিয়েছিল। এর ফলে গ্রিক দর্শনের মূলনীতিগুলো মুসলিম পণ্ডিতদের ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিপদ্ধতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়, যা তাদের জন্য একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং দার্শনিক আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

একইভাবে, তাদের তাওহিদের ধারণায় নব্য-প্লেটোবাদের 'পরম এক' (Absolute One)-এর প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। আশআরিদের মতে, আল্লাহর গুণাবলি তাঁর মূল সত্তা থেকে পৃথক নয়; বরং এগুলো কোনো বিশেষ ধরণ বা প্রকৃতি (modality) ছাড়াই বিদ্যমান – যা অ্যারিস্টটলের 'সত্তা ও উপনিহিত গুণ' (Substance and Accidents) দর্শনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অন্যদিকে, মাতুরিদিরা নিয়তিবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন, যা মূলত নব্য-প্লেটোবাদের 'নির্গমন নীতি' বা 'ইমানেশন' (Emanation)-এরই অনুরূপ।

সুতরাং যারা বলেন, ইমাম আশআরি, ইমাম মাতুরিদি এবং আবু হাশিম আল-জুব্বাই গ্রিক দর্শনের আরবি অনুবাদ আরব দেশে ছড়িয়ে পড়ার আগেই ইসলামি ধর্মতত্ত্বের এসব আলোচনার ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন, তাদের এই ধারণা মোটেও সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, এই ধর্মতাত্ত্বিদগণ তখনই জ্ঞানচর্চার অঙ্গনে সক্রিয় হয়েছিলেন, যখন গ্রিক দর্শনের অনুবাদ সম্পন্ন হয়ে তা ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের সাথে পুরোপুরি মিশে গিয়েছিল।তাদের ব্যবহৃত যুক্তিপদ্ধতি, যৌক্তিক কাঠামো এবং বিমূর্ত প্রকাশভঙ্গি একথাই প্রমাণ করে যে, তাদের চিন্তাধারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রিক যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত ছিল।সুতরাং, এটাই অধিক যুক্তিযুক্ত যে, এই বিষয়গুলো যদিও প্রাথমিকভাবে ইসলামি শাস্ত্র এবং অভ্যন্তরীণ ফেরকাগত দ্বন্দ্ব থেকে উৎসারিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে বিদেশি দর্শনের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। মুতাজিলা মতাদর্শের অনুসারী আবু হাশিম আল-জুব্বাই (৩২১ হিজরি) আব্বাসি খিলাফতের সেই স্বর্ণযুগে বসবাস করতেন, যখন বাইতুল হিকমার অনুবাদ আন্দোলন ছিল মধ্যগগনে – অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরি শেষভাগ থেকে তৃতীয় হিজরি মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যেই দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা ও বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ গ্রিক গ্রন্থগুলো আরবিতে অনূদিত হয়েছে। আবু হাশিমের পিতা আবু আলি আল-জুব্বাইও (৩০৩ হিজরি) এমন এক বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন, যেখানে গ্রিক দর্শনের সাথে ইসলামি ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাধারার সমন্বয় সাধনের নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছিল।

একইভাবে, ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরি (২৬০-৩২৪ হিজরি), যিনি শুরুতে মুতাজিলা ছিলেন, পরবর্তীকালে সুন্নি আকিদা রক্ষার তাগিদে অনন্য এক ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তার বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং অবরোহী যুক্তিপদ্ধতি (deductive reasoning) একথাই প্রমাণ করে যে, তিনিও গ্রিক প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না।যদিও তিনি মুতাজিলাদের কিছু সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন, কিন্তু তার উপস্থাপিত যুক্তিপ্রক্রিয়া ছিল সেই যৌক্তিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা গ্রিক দর্শনের মাধ্যমেই ইসলামি চিন্তাধারায় প্রবেশ করেছিল।

ইমাম মাতুরিদি (৩৩৩ হিজরি) ছিলেন ইমাম আশআরির সমসাময়িক। তিনি নিজে প্রথাগত অর্থে কোনো দার্শনিক না হলেও তার ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলোতে যুক্তি ও তর্কের প্রাধান্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তার যুক্তিপদ্ধতিতে যে ধরনের বিমূর্ত ধারণা, জটিল আলোচনা এবং সূক্ষ্ম যৌক্তিক বিতর্কের উপস্থিতি দেখা যায়, তা এটাই নির্দেশ করে যে, তার সময়কার পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিবেশ গ্রিক যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের প্রভাব থেকে মোটেও মুক্ত ছিল না।

তবে আল্লাহর গুণাবলি, নিয়তিবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছা কিংবা ইমান ও আমলের মতো বিষয়গুলো ইসলামি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকালেই অভ্যন্তরীণভাবে উৎসারিত হয়েছিল।এমনকি সাহাবি ও তাবেয়িদের যুগেও এসব বিষয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তবে পরবর্তী সময়ে ধর্মতাত্ত্ববিদগণ যেভাবে একটি যৌক্তিক, বিমূর্ত ও তর্কমূলক পদ্ধতিতে এসব প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, গ্রিক যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের অনুপ্রবেশ ছাড়া তা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা – যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল 'সিলজিজম' (Syllogism) বা অনুমিতি, তা ইলমে কালামের বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোর ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে।এটা ধর্মীয় চিন্তাধারাকে তার সহজাত প্রকৃতি ও শাস্ত্রীয় রূপ থেকে সরিয়ে এক বিমূর্ত ও দার্শনিক ছাঁচে ফেলে দিয়েছে।

তাই কেবল সময়ের পরম্পরা বা কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতার দোহাই দিয়ে কোনো ধর্মতাত্ত্ববিদকে গ্রিক প্রভাবমুক্ত মনে করা মোটেও সঠিক নয়।বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব কেবল সময়ের ক্রমানুসারে দৃশ্যমান হয় না; বরং তা ফুটে ওঠে চিন্তার গভীরে এবং যুক্তি প্রদানের ধরণে। আর এই ধর্মতাত্ত্ববিদগণ যখন জ্ঞানতাত্ত্বিক বিতর্কে সক্রিয় ছিলেন, ততদিনে গ্রিক দর্শন ইসলামি ধর্মতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের মেজাজ, ভাষা এবং পদ্ধতির সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল।

যদিও তারা প্রায়শই গ্রিক দর্শনের কঠোর সমালোচনা করতেন, কিন্তু বাস্তবতা হলো, তাদের যুক্তিপ্রক্রিয়া, দার্শনিক আলোচনা এবং তর্কের ভিত্তি বহুলাংশেই ছিল গ্রিক দর্শনের মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইমাম গাজালি (৫০৫ হিজরি) তার 'তাহাফুতুল ফালাসিফা' গ্রন্থে দর্শনের তীব্র সমালোচনা করলেও তার নিজের যুক্তিপদ্ধতিতে গ্রিক যুক্তিবিদ্যার প্রভাব ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট।একইভাবে ইমাম রাজিও (৬০৬ হিজরি) দর্শনের মূলনীতির আলোকেই ইসলামি বিশ্বাসকে প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন।

এই সমস্ত তথ্যপ্রমাণ আল্লামা ইকবাল, শিবলী নুমানি এবং জাভেদ আহমেদ গামিদি-র সেই অবস্থানকেই সমর্থন করে যে, ইলমে কালাম নিছক কোনো অভ্যন্তরীণ ইসলামি জ্ঞানতাত্ত্বিক আন্দোলন ছিল না; বরং এর গঠন ও বিকাশে গ্রিক দর্শনের মূলনীতি ও প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ধর্মতাত্ত্বিদগণ দার্শনিক পরিভাষা ও আলোচনা গ্রহণ করে ধর্মীয় চিন্তাধারাকে এমন এক তাত্ত্বিক রূপ দিয়েছিলেন, যা সহজ, স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধির পরিবর্তে মূলত বিমূর্ত ও যৌক্তিক বিতর্কে পর্যবসিত হয়েছিল। আর এভাবেই ইসলামের মূল বাণীর ওপর দর্শনের জটিল আবরণ তৈরি হয়েছিল।

তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

খিলাফত

জাভেদ আহমেদ গামিদি

এতে সন্দেহ নেই যে, খিলাফত শব্দটি এখন কয়েক শতাব্দী ধরে পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, কিন্তু এটা কোনোভাবেই ধর্মীয় পরিভাষা নয়। ধর্মীয় পরিভাষা রাজি, গাজালি, মাওয়ার্দি, ইবনে হাজম ও ইবনে খালদুনদের তৈরির মাধ্যমে গঠিত হয় না এবং মুসলমানরা বিশেষ কোনো অর্থে কোনো শব্দ ব্যবহার শুরু করলেই সেটা ধর্মীয় পরিভাষা হয়ে যায় না। এগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলদের তৈরির মাধ্যমে গঠিত হয় এবং কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন এগুলোর পারিভাষিক অর্থ কুরআন ও হাদিসের অকাট্য দলিল বা অন্যান্য আসমানি কিতাব থেকে প্রমাণ করা যায়। রোজা, নামাজ, হজ্জ ও ওমরা ইত্যাদি এ কারণেই ধর্মীয় পরিভাষা যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলগণ এগুলোকে এই মর্যাদা দিয়েছেন এবং বিভিন্ন স্থানে সেগুলোকে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। এর বিপরীতে 'খিলাফত' শব্দটি আরবি ভাষার একটি শব্দ এবং এটা প্রতিনিধিত্ব, উত্তরাধিকার এবং শাসন ও ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এগুলো এর আভিধানিক অর্থ এবং কুরআন ও হাদিসের সব জায়গায় এটা এর আভিধানিক অর্থগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কুরআনের যেসব আয়াতে 'খলিফা' ও 'খিলাফত' শব্দগুলো তাদের অনুবাদে হুবহু রেখে দিয়ে মানুষকে এটা বিশ্বাস করানোর জন্য পেশ করা হয়েছে যে, কুরআন এই শব্দটি বিশেষ কোনো পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেছে – সেগুলো যেকোনো নির্ভরযোগ্য অনুবাদ বা তাফসিরে দেখে নিলেই প্রকৃত সত্য এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, মন্তব্য করার মতো কোনো শব্দই আর অবশিষ্ট থাকবে না, যেমনটি আমার সমালোচকদের একজন জ্ঞানী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও অবশিষ্ট থাকেনি।

তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

আমি এখানে দুই প্রখ্যাত আলেমের অনুবাদ পেশ করছি।লক্ষ করুন:

- ১. সুরা বাকারার (২:৩০) আয়াত:

“আর যখন বলল তোমার রব ফেরেশতাদেরকে, আমাকে বানাতে হবে জমিনে একজন নায়েব (প্রতিনিধি) ।” (শাহ আবদুল কাদির)

“আর যখন বলল তোমার রব ফেরেশতাদেরকে যে, আমি বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি জমিনে একজন নায়েব ।” (মাওলানা মাহমুদ হাসান)

- ২. সুরা সোয়াদের (৩৮:২৬) আয়াত:

“হে দাউদ, আমরা করেছি তোমাকে নায়েব এই দেশে, সুতরাং তুমি রাজত্ব করো মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে ।” (শাহ আবদুল কাদির)

“হে দাউদ, আমরা করেছি তোমাকে নায়েব এই দেশে, সুতরাং তুমি রাজত্ব করো মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে ।” (মাওলানা মাহমুদ হাসান)

- ৩. সুরা নুরের (২৪:৫৫) আয়াত:

“ওয়াদা দিলেন আল্লাহ যারা তোমাদের মধ্যে ইমান এনেছে এবং করেছে তারা নেক কাজ, অবশ্যই পরে শাসক করবে তাদেরকে দেশে, যেমন শাসক করেছিলেন তাদের আগের লোকদেরকে ।” (শাহ আবদুল কাদির)

“ওয়াদা করে নিয়েছেন আল্লাহ ঐসব লোকদের সাথে, যারা তোমাদের মধ্যে ইমান এনেছে এবং করেছে তারা নেক কাজ, অবশ্যই পরে শাসক করবে তাদেরকে দেশে, যেমন শাসক করেছিলেন তাদের আগের লোকদেরকে ।” (মাওলানা মাহমুদ হাসান)

‘নায়েব’ এবং ‘শাসক’ শব্দগুলো এই আয়াতগুলোতে خَلِيْفَة (খলিফা) ও اِسْتِخْلَاف (ইসতিখলাফ)-এর অনুবাদ। আর এটা পরিষ্কার যে, এগুলো নিজেদের মধ্যে কোনো ধর্মীয় অর্থ রাখে না; যদি না কোনো ব্যক্তি এই দুঃসাহস দেখায় যে, আরবি ভাষার যে শব্দই কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই ধর্মীয় পরিভাষা হয়ে যায়।

হাদিস ও আসারের (সাহাবিদের উক্তি) বিষয়টিও ঠিক এমন। সেগুলোতেও 'খিলাফত' শব্দ এবং এর সমস্ত রূপান্তর সেই সব অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি অর্থে خَلِيْفَة (খলিফা) শব্দটি স্বয়ং আল্লাহতায়ালার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণেই 'হেদায়েতপ্রাপ্ত শাসন' বা 'নবুয়তের তরিকায় শাসন'-এর মতো বিষয় প্রকাশ করার উদ্দেশ্য হলে তার জন্য কেবল এই শব্দটিই যথেষ্ট হয় না; বরং এর সাথে 'রাশেদাহ' এবং 'আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ'-এর মতো বিশেষণ যুক্ত করতে হয়। আমাদের ওলামায়ে কেরাম এ ধরনের বিশেষণগুলোকে উহ্য ধরে খিলাফতকে একটি পরিভাষা বানিয়েছেন। এই দিক থেকে এটা মুসলমানদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের একটি পরিভাষা তো অবশ্যই হতে পারে – যেমন ফিকহ, কালাম, হাদিস এবং এ জাতীয় অন্যান্য শাস্ত্রের পরিভাষা রয়েছে; কিন্তু এটা ধর্মীয় পরিভাষা হতে পারে না। আল্লাহ ও রাসুল ছাড়া আর কারো এই সত্তা বা অধিকার নেই যে, তারা কোনো শব্দকে ধর্মীয় পরিভাষা ঘোষণা করবেন। এটা কেবল তাঁদেরই অধিকার এবং কোনো শব্দের ব্যাপারে এটা ধর্মীয় পরিভাষা হওয়ার দাবি তাঁদের বাণী থেকেই প্রমাণ করতে হবে। এটা ইবনে খালদুনের 'মুকাদ্দামা' থেকে প্রমাণ করা যাবে না।

বাকি রইল এই কথা যে, পৃথিবীতে মুসলমানদের একটিই রাষ্ট্র থাকতে হবে এবং এটা ইসলামের নির্দেশ; তবে কুরআন সম্পর্কে অবগত প্রত্যেক আলেম জানেন যে, কুরআন এ জাতীয় যেকোনো নির্দেশ থেকে পুরোপুরি শূন্য। অবশ্য এর সপক্ষে দুটি হাদিস পেশ করা হয়: তার মধ্যে একটি হলো রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন – বনি ইসরাইলের ওপর নবীরা শাসন করতেন। ফলে একজন নবী পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হতেন; কিন্তু আমার পরে কোনো নবী নেই, তবে শাসক হবে এবং অনেক হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো: তাদের ব্যাপারে আপনি আমাদের কী আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন: প্রথমজনের সাথে আনুগত্যের অঙ্গীকার পূর্ণ করো, এরপর তার সাথে যে তার পরে প্রথম হবে।[১] দ্বিতীয়টি হলো – যখন দুই শাসকের হাতে বায়াত গ্রহণ করা হবে, তখন দ্বিতীয়জনকে হত্যা করো।[২] এই দ্বিতীয় হাদিসটির ব্যাপারে যদিও সনদের দিক থেকে অনেক আলোচনা রয়েছে, তবে তর্কের খাতিরে এটা মেনে নিলেও এই সত্যটি অনস্বীকার্য যে, এই হাদিসগুলোতে সেই কথাটি মোটেও বলা হয়নি, যা এগুলো দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়।

[১] বুখারি, রেওয়ায়েত নম্বর: ৩৪৫৫; মুসলিম, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৮৪২।
[২] মুসলিম, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৮৫৩।

এগুলোতে যা বলা হয়েছে তা হলো – মুসলমানরা যদি নিজেদের শাসনের জন্য কোনো ব্যক্তির হাতে বায়াত হয় এবং এরপরে অন্য কেউ বিদ্রোহ করে দাঁড়িয়ে যায় এবং মানুষকে বায়াতের আহ্বান জানায়, তবে প্রতিটি মুসলমানকে প্রথম বায়াতের ওপর অটল থাকতে হবে।তদুপরি যদি দ্বিতীয়জন নিজের শাসন ঘোষণা করে দেয় এবং কিছু লোক তার হাতে বায়াতও হয়ে যায়, তবে তাকে হত্যা করা হবে।

এটা স্পষ্ট যে, এগুলো এমন নির্দেশনা, যার যৌক্তিকতা প্রত্যেক মানুষের কাছে স্পষ্ট করা যায়।ফলে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পরে যখন আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এই প্রস্তাব দিলেন যে, আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে একজন করে শাসক বানানো হোক, তখন সাইয়্যিদুনা ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এই মূলনীতির ভিত্তিতেই বললেন যে, এটা তো এক খাপে দুই তলোয়ার হয়ে যাবে।সিদ্দিকে আকবর আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-ও এই সুযোগে মানুষকে সতর্ক করেছিলেন যে, এক রাজ্যে দুই শাসক হতে পারে না।কারণ, এর ফল এটাই দাঁড়াবে যে, কঠিন মতভেদ সৃষ্টি হবে, কল্যাণের বদলে ফাসাদ বাড়বে, পুরো শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে এবং রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষকে যে পদ্ধতিতে রেখে গিয়েছিলেন, তার জায়গায় এই বিদআত চলে আসবে যে, একই রাজ্যে দুইজন লোক শাসন করছে।[৩]

এই বর্ণনাগুলোর সম্পর্ক যদি আল্লাহর নবীর সাথে সঠিক হয়ে থাকে, তবে তিনি যা বলেছেন, তা এটাই ছিল।এগুলো থেকে কোনো যুক্তি দিয়েই এই কথা বের করা সম্ভব নয় যে, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে দুনিয়ায় একটি সরকার কায়েমের নির্দেশ দিয়েছে।ইসলামের প্রচারকগণ যদি কখনো আমেরিকা, ব্রিটেন বা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে অধিকাংশ মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করতে সফল হন, তবে এই হাদিস ও আসারের ভিত্তিতে তারা নিজ দেশে নিজেদের আলাদা সরকার কায়েম করতে পারবে না – এমনটি নয়; আর যদি তারা করে, তবে গুনাহগার হবে না, যেমনিভাবে বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশটি দেশের মুসলমানরা [গুনাহগার] হচ্ছে না।

[৩] বায়হাকি, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৬৫৪৯-১৬৫৫০।

ওলামায়ে কেরামকে সতর্ক থাকতে হবে যে, আল্লাহর ধর্মে যে কথা যতটুকু, তাকে ততটুকুই রাখা উচিত। এটা কোনো আলেম, ফকিহ বা মুহাদ্দিসের অধিকার নয় যে, তিনি মানুষকে এমন একটি বিষয়ে বাধ্য করবেন, যেটার ব্যাপারে তাদের পালনকর্তা তাদেরকে বাধ্য করেননি। ফলে আমি লিখেছি এবং আবারও বলছি যে, যেসব দেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তাদের একটি 'ইউনাইটেড স্টেটস' বা যুক্তরাষ্ট্র গঠন আমাদের প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা হতে পারে এবং আমরা এটা পূর্ণ করার জন্য সংগ্রামও করতে পারি; কিন্তু এই ধারণার কোনো ভিত্তি নেই যে, এটা ইসলামি শরিয়তের কোনো নির্দেশ, যার লঙ্ঘনে মুসলমানরা গুনাহের ভাগী হচ্ছে।

[২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ]

মওলানা সাইয়্যিদ আবুল আলা মওদুদি – এক যুগান্তকারী চিন্তাবিদ

মুহাম্মদ হাসান ইলিয়াস

এমন মেধার কাছে জ্ঞান কোনো প্রাণহীন তথ্যের স্তূপ নয়, কিংবা স্মৃতিতে জমা রাখা কোনো স্থবির উত্তরাধিকারও নয়।তাদের কাছে জ্ঞান হলো একটি জীবন্ত, সজাগ এবং গতিশীল চেতনা – এমন কিছু, যা মানুষের যুক্তির গভীরে প্রবেশ করে, প্রাণহীন চিন্তাকে আন্দোলনে আলোড়িত করে এবং উপলব্ধির আলো দিয়ে বোধশক্তির রুদ্ধ পথগুলোকে আলোকিত করে। তারা কেবল চিন্তাবিদ নন, বরং চিন্তাকে সৃজনশীল অভিব্যক্তিতে রূপদান করেন।তারা যখন ইলমি বা জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের অংশ হন, তখন তারা কেবল এতে কিছু যোগ করেন না – বরং একে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দান করেন। এরূপ ব্যতিক্রমী, মেধাবী এবং অসাধারণ মস্তিষ্ক প্রতিদিন জন্মগ্রহণ করে না; শতাব্দীকাল তাদের আগমনের অপেক্ষায় থাকে।কিন্তু যখন তারা আবির্ভূত হন, তখন তারা বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের ধারাকে পরিবর্তন করে দেন।যখন এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক উচ্চতা, ব্যাখ্যামূলক অন্তর্দৃষ্টি এবং সৃজনশীল ক্ষমতা একটি একক ব্যক্তিত্বে মিলিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি কেবল একজন আলেম থাকেন না – তিনি একটি যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোর মূল অক্ষে পরিণত হন।ইসলামের ইলমি ঐতিহ্যে আবুল-আলা মওদুদি ছিলেন এমনই এক বহুমুখী ব্যক্তিত্ব।এই বিভিন্ন গুণাবলি তার মধ্যে এমনভাবে একত্র হয়েছিল যে, বিংশ শতাব্দীতে বুদ্ধিবৃত্তিক দিগন্তে তিনি একটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা (স্কুল অফ থট) হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

এই ব্যতিক্রমী মর্যাদা কেবল আবেগীয় প্রশংসা বা সাময়িক খ্যাতির ফসল ছিল না। এটা ছিল একটি নীতিগত, সুসংজ্ঞায়িত এবং যাচাইযোগ্য শ্রেষ্ঠত্ব – যা ধর্মের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের স্বীকৃত মানদণ্ডের বিপরীতে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এই ঐতিহ্যে একজন চিন্তাবিদের মর্যাদা ও প্রভাব চারটি মৌলিক মানদণ্ডের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়:

১. ভাষা ও যুক্তির মৌলিক বিজ্ঞান

প্রথম ক্ষেত্রটি সেই আলেমদের নিয়ে গঠিত, যারা ধর্মকে বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং মানুষের কাছে তা কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শাস্ত্রগুলো তৈরি করে ইসলামি বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।এর মধ্যে এমন সব ভাষাগত ও যৌক্তিক বিদ্যা অন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে শব্দের সঠিক অর্থ, বাক্যের গঠন এবং ভাব বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন: ব্যাকরণ (নাহু), শব্দতত্ত্ব (সরফ), অভিধানতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব (মাআনি), অলঙ্কারশাস্ত্র (বয়ান), বর্ণনাশৈলী (বদি) এবং যুক্তিবিদ্যা (মানতিক)।এই বিদ্যাগুলোর প্রকৃতি মৌলিক ও সার্বজনীন; এগুলো কেবল ধর্মীয় গ্রন্থ বোঝার জন্যই নয়, বরং যেকোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্যিক প্রকাশের গভীরতা বিশ্লেষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীতে এই বিদ্যাগুলো আরও প্রায়োগিক রূপ লাভ করে, যেমন – হাদিস বিশারদদের সমালোচনা পদ্ধতি (জারহ-ওয়াতাদিল), হাদিসের পরিভাষা এবং অন্যান্য শাস্ত্র, যেখানে এই নিয়মগুলোকে সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল।

তারা সেই ভাষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি তৈরি করেছিলেন, যার ওপর ইসলামি জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে আছে। এটা কেবল ওহির মর্মার্থ বুঝতেই সাহায্য করেনি, বরং ইসলামের শিক্ষা ও প্রচারকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে এবং একে সংরক্ষিত রেখেছে। খলিল ইবনে আহমদ, সিবাওয়াইহ, আব্দুল কাহির আল-জুরজানি, আল-খতিব আল-বাগদাদি, আয-যামাখশারি এবং ইবনে হাজারের মতো মনীষীরা – যারা এই শাস্ত্রগুলো সংকলনে অবদান রেখেছেন – তারাই হলেন এই বিশাল জ্ঞান-সৌধের স্থপতি।তারাই সেই চিন্তাবিদ, যারা ভাষাগত প্রকাশের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ওহি বোঝার পথ দেখিয়েছিলেন এবং ইসলামি ঐতিহ্যের মূল ভিত্তিগুলোকে সুসংগঠিত করেছিলেন।

২. ফকিহ ও কালামশাস্ত্রীয় চিন্তার পদ্ধতিগত বিন্যাস

দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি সেইসব আলেমদের নিয়ে গঠিত, যারা ওপরের ভাষাগত ও যৌক্তিক শাস্ত্রগুলোতে পারদর্শী ছিলেন এবং ধর্মকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি সুসংগত, সমন্বিত ও নীতিগত কাঠামো তৈরি করেছিলেন।তারা কেবল মূল পাঠ্য বা টেক্সটগুলো বুঝতেই চেষ্টা করেননি, বরং সেগুলোকে একটি সুশৃঙ্খল একাডেমিক রূপ দান করেছেন।তাদের মাধ্যমেই ফিকহ (ইসলামি আইন), কালাম (তত্ত্ববিদ্যা) এবং তাফসিরের (কুরআনের ব্যাখ্যা) মতো শাস্ত্রগুলোর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।এই মৌলিক ও ব্যাখ্যামূলক শাস্ত্রগুলোর কারণেই ইসলামি চিন্তাধারা একটি শক্তিশালী যৌক্তিক ভিত্তি, ধারাবাহিকতা এবং আইনি কাঠামো লাভ করেছে।

ইমাম শাফি, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আর-রাজি এবং তাদের মতো অন্যান্য মনীষীরা এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। তারা হলেন সেই চিন্তাবিদ, যারা ধর্মের বিচ্ছিন্ন দলিল ও প্রমাণগুলোকে একটি সুসংগত, যুক্তিযুক্ত এবং সুবিন্যস্ত ঐতিহ্যে রূপান্তর করেছেন। তাদের মাধ্যমেই ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতিগুলো তৈরি হয়েছে, আকিদাগত অবস্থান রক্ষার জন্য কালামশাস্ত্র সংগঠিত হয়েছে এবং কুরআনের ব্যাখ্যা একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো পেয়েছে।এভাবেই এই ক্ষেত্রটি ইসলামি চিন্তাধারার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, তাত্ত্বিক গভীরতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্কতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

৩. সমালোচনামূলক পুনর্মূল্যায়ন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণ

তৃতীয় ক্ষেত্রে সেইসব চিন্তাবিদ রয়েছেন, যারা ঐতিহ্যকে কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোনো মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করেননি। পরিবর্তে, তারা এর গভীরে প্রবেশ করেছেন, এর ভিত্তিগুলো যাচাই করেছেন এবং বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা পুনর্মূল্যায়ন করেছেন।তারা যুক্তি ও জ্ঞানের আলোকে ঐতিহ্যকে নতুন করে দেখেছেন এবং আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা বোঝার চেষ্টা করেছেন।

এই মনীষীরা ঐতিহ্যের বাহ্যিক জাঁকজমক দেখে বিমোহিত হননি, বরং এর ভেতরের যুক্তি, ধারণাগত কাঠামো এবং যৌক্তিক ভিত্তিগুলো গভীরভাবে পরীক্ষা করেছেন।তারা সেই জায়গাগুলো চিহ্নিত করেছেন, যেখানে ঐতিহ্য সময়ের বিবর্তনে বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতা, অগভীর ব্যাখ্যা এবং স্ববিরোধী ধারণার কবলে পড়েছিল।

তাদের এই সমালোচনামূলক দৃষ্টি নিশ্চিত করেছে যে, ঐতিহ্য যেন কেবল অতীতের কোনো স্মৃতিচিহ্ন হয়ে না থাকে, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে প্রাসঙ্গিক এক নতুন চিন্তা হিসেবে পুনর্গঠিত হয়। ইবনে রুশদ, ইবনে খালদুন, ইবনে কাইয়্যিম, ইকবাল এবং রশিদ রেজা এই শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেন।

৪. ঐতিহ্য, সমালোচনা এবং পুনর্জাগরণের সংশ্লেষণ

চতুর্থ এবং শেষ ক্ষেত্রে সেইসব চিন্তাবিদ অন্তর্ভুক্ত, যারা ধর্মের একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য মৌলিক, সমালোচনামূলক এবং ঐতিহ্যগত উপাদানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন – যা অতীতে প্রোথিত হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানের সাথে সংলাপমুখর এবং ভবিষ্যতের জন্য দূরদর্শী।এই স্তরে জ্ঞান কেবল বই লেখা বা সমালোচনার ঊর্ধ্বে গিয়ে একটি অত্যাবশ্যক অভিজ্ঞতা, একটি জীবন্ত ব্যবস্থা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত জীবনদর্শনে পরিণত হয়। ইবনে তাইমিয়া, আল-গাজ্জালি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং ফারাহি এই ক্ষেত্রের উদাহরণ। এরাই সেই বুদ্ধিজীবী, যারা ধর্মকে নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোর মধ্যে জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসেবে পুনরায় ব্যক্ত করেছেন – এমন কাঠামো, যা ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত থেকেও আধুনিক মানুষের চেতনার সাথে মিলে যায়। তাদের মাধ্যমে ধর্মীয় চিন্তা তার শিকড় ধরে রাখার পাশাপাশি যুক্তিগত শক্তি, নৈতিক জীবনীশক্তি এবং সভ্যতার প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে।এভাবে ধর্ম তার উদ্দেশ্যের প্রতি দায়বদ্ধ এবং পরিধিতে ব্যাপক এক মহান আখ্যান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

যখন আমরা মওলানা মওদুদির মতো একজন চিন্তাবিদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানকে গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়ন করি, তখন প্রশ্নটি তিনি একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন কি না তা নিয়ে নয়।আসল প্রশ্ন হলো: তিনি ইসলামি চিন্তাধারায় নীতিগত, সৃজনশীল এবং স্থায়ী অবদান রেখেছিলেন কি না – যা একজন আলেমকে যুগান্তকারী ব্যক্তিত্বের কাতারে উন্নীত করে। তার লেখাগুলো কি কেবল ঐতিহ্যের প্রতিধ্বনি ছিল, নাকি তিনি একটি সুসংগত এবং নীতিগত বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন – যা ইলমি পদ্ধতি, বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামো, সমালোচনামূলক অন্তর্দৃষ্টি এবং নতুন ব্যাখ্যাকে সমন্বিত করে এবং অতীতের চেতনার প্রতি অনুগত থেকে সমকালীন প্রশ্নগুলোর সাথে অর্থপূর্ণভাবে যুক্ত হয়?

মওলানা মওদুদির প্রথম বড় অবদান হলো ধর্ম বোঝার ভাষা এবং যৌক্তিক কাঠামোর উন্নয়ন। তিনি ইসলামি চিন্তার মূল শব্দগুলোকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি উর্দুকে কেবল ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেননি, বরং একে একটি শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষা হিসেবে গড়ে তুলেছেন – যা ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সক্ষম। তার এই কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ধর্মীয় পরিভাষাগুলোর নতুন ও গভীর ব্যাখ্যা প্রদান।

তিনি রব, ইলাহ, দ্বীন, ইবাদত, তাগুত, আনুগত্য, শরিয়ত, জীবনব্যবস্থা, ইলাহি আইন এবং ইতমামে হুজ্জাতের মতো মৌলিক ধারণাগুলোকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তার মতে, 'রব' কেবল স্রষ্টা নন, বরং তিনি এমন এক সার্বভৌম প্রতিপালক ও আইনদাতা, যিনি জীবনের প্রতিটি দিক পরিচালনা করেন। 'ইলাহ' কেবল উপাসনার বস্তু নন, বরং তিনি সেই সত্তা, যাঁর প্রতি আমাদের পূর্ণ আনুগত্য থাকতে হবে। 'দ্বীন' কোনো ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক বিষয় নয়, বরং এটা একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত ব্যবস্থা। 'ইবাদত' মানে কেবল ধর্মীয় আচার নয়, বরং এটা আল্লাহর প্রতি সচেতন আত্মসমর্পণ ও সামগ্রিক দাসত্বের প্রকাশ। 'আনুগত্য' কোনো সাময়িক বিষয় নয়, বরং এটা জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ মেনে চলার একটি স্থায়ী মানসিকতা। 'ইতমামে হুজ্জাত' মানে কেবল দাওয়াত দেওয়া নয়, বরং এটা মানুষকে আল্লাহর সামনে নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ করার একটি প্রক্রিয়া। আর 'তাগুত' হলো সেই সব ব্যবস্থা বা শক্তি, যা মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব থেকে দূরে সরিয়ে অন্য কারো আনুগত্য করতে বাধ্য করে।

মওলানা মওদুদি এই শব্দগুলোকে আলাদা আলাদা সংজ্ঞা হিসেবে দেখেননি। বরং তিনি এগুলোকে একটি সুসংহত জীবনদর্শনের অংশ হিসেবে সাজিয়েছেন। তার লেখায় এই শব্দগুলো একে অপরের সাথে এমনভাবে মিলে যায় যে, তা একটি পূর্ণাঙ্গ চিন্তাধারা গঠন করে। তার এই কাজের সেরা উদাহরণ হলো 'খুতবাত', 'দ্বীনে হক', 'ইসলামি সভ্যতার মূলনীতি' এবং 'ইসলামের জীবনব্যবস্থা' বইগুলো। তবে এর সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখা যায় 'তাফহিমুল কুরআন'-এ। এটা কেবল কুরআনের ব্যাখ্যা নয়, বরং এটা একটি আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ। এখানে তিনি কুরআনের শব্দগুলোকে কেবল আভিধানিক অর্থে নয়, বরং প্রেক্ষাপট ও সামগ্রিক জীবনদর্শনের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। এভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে মওলানা মওদুদি একজন সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন।

তিনি ধর্মীয় পরিভাষাগুলোতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন এবং এমন একটি কাঠামো তৈরি করেছেন, যা আধুনিক মানুষের কাছে ইসলামকে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম।এটা এমন একটি অসামান্য কাজ, যা কেবল একজন প্রকৃত চিন্তাবিদই করতে পারেন, যিনি বিশ্বাসকে নতুন করে ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি তা বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় মাধ্যমও তৈরি করেন।

মওলানা মওদুদির দ্বিতীয় বড় অবদান হলো ধর্মীয় মতবাদ ও বিধানগুলোকে একটি সুশৃঙ্খল এবং যৌক্তিক কাঠামোতে সাজানো।এখানে ধর্ম কেবল বিচ্ছিন্ন কিছু নিয়মের সমষ্টি নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থা – যেখানে প্রতিটি ব্যাখ্যা ও যুক্তি একটি নির্দিষ্ট নীতি মেনে চলে। এই ক্ষেত্রে তিনি কেবল একজন সাধারণ আইন বিশেষজ্ঞ বা ফকিহ ছিলেন না, বরং তিনি ইসলামি চিন্তাধারাকে একটি শক্তিশালী যৌক্তিক ভিত্তি এবং পদ্ধতিগত সামঞ্জস্য দান করেছিলেন।এই ক্ষেত্রে তার কাজের বড় বৈশিষ্ট্য হলো কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকা। যদিও তার চিন্তায় হানাফি মাযহাবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তিনি কেবল অন্ধ অনুকরণের (তাকলিদ) ওপর নির্ভর করেননি। উদাহরণস্বরূপ, সুদের বিষয়ে তিনি কেবল পুরনো আইনি নজির দেখেননি, বরং কুরআনের নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আলোকে এর নিষিদ্ধ হওয়ার যৌক্তিক কারণগুলো তুলে ধরেছেন। পর্দার মতো বিষয়গুলোতেও তিনি কুরআনের আয়াত, হাদিস, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটকে মিলিয়ে একটি চমৎকার ও সুসংগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

তার ইজতিহাদের মূল ভিত্তি ছিল এই নীতিগত অন্তর্দৃষ্টি।তিনি কেবল শাব্দিক অর্থ নিয়ে পড়ে থাকেননি, আবার আধুনিকতাকে তুষ্ট করার জন্য ওহির মূল অর্থও বিকৃত করেননি।বরং তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ঐতিহ্য ও আধুনিক যুক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন।একটি ইসলামি রাষ্ট্রের রূপরেখা তৈরিতেও তিনি এই সমন্বয়বাদী নীতি অনুসরণ করেছেন – যেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও শরিয়তের শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি পরামর্শমূলক শাসন ও জনমতের গুরুত্বও তুলে ধরা হয়েছে।

মওলানা মওদুদির যুক্তিপদ্ধতির একটি অনন্য দিক হলো 'ইস্যু-ভিত্তিক' আলোচনা। যেকোনো নতুন সমস্যা বা সমকালীন চ্যালেঞ্জকে তিনি কেবল ফতোয়া দেওয়ার বিষয় হিসেবে দেখেননি, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানের সুযোগ হিসেবে নিয়েছেন। এ কারণেই তিনি মতভেদকে স্বাগত জানাতেন। বিশেষ করে 'ইতমামে হুজ্জাত'-এর মতো বিষয়ে তিনি কেবল প্রচলিত বর্ণনার ওপর নির্ভর না করে কুরআনের দাওয়াহ পদ্ধতি, নববী ইতিহাস এবং মানুষের সহজাত প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা তৈরি করেছেন। তার এই বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা 'ইসলামের জীবনব্যবস্থা', 'ইসলামি রাষ্ট্র' এবং 'তাফহিমুল কুরআন'-এর মতো বইগুলোতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তার কাজগুলো প্রমাণ করে যে, তিনি ইসলামি চিন্তাধারাকে একটি নতুন ইজতিহাদি রূপ দিয়েছেন। তার চিন্তা যেমন ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তেমনি তা আধুনিকতা দ্বারা অন্ধভাবে প্রভাবিতও নয়। তিনি ধর্মকে যুক্তি, ওহি এবং মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি জীবন্ত সংলাপ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন – যা একজন যুগান্তকারী চিন্তাবিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয় ক্ষেত্রটি হলো সমালোচনামূলক মূল্যায়ন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ। এটা মওদুদির চিন্তাধারার একটি স্থায়ী দিক। তিনি ঐতিহ্যের পবিত্রতাকে সম্মান করতেন, কিন্তু ফিকহ, তাফসির বা তাসাউফের কোনো ব্যাখ্যাকেই প্রশ্নাতীত মনে করতেন না। তার মতে, ঐতিহ্যের যেসব বিষয় বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতা বা সংকীর্ণতা তৈরি করে, প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে সেগুলোর পুনর্মূল্যায়ন করা জরুরি ছিল। মওলানা মওদুদির এই সাহসী অবস্থান তার 'তানকিহাত' এবং 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বইয়ে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে তিনি বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন – যে রাজতন্ত্রকে পরবর্তী সময়ের মুসলিম ইতিহাস ধর্মীয় প্রয়োজনের অজুহাতে জায়েজ করার চেষ্টা করেছিল। তিনি অন্ধ অনুকরণের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, কারণ এটা ইজতিহাদকে কেবল পুরনো রায়ের পুনরাবৃত্তিতে পরিণত করেছিল এবং আধুনিক সমস্যার সমাধানে ধর্মকে অকার্যকর করে দিচ্ছিল। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরাধিকারীদের জন্য ওসিয়ত করার বিষয়ে তিনি প্রচলিত ধারণার বদলে কুরআনের দেওয়া অধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলোকে প্রেক্ষাপটসহ নতুনভাবে বোঝার আহ্বান জানিয়েছেন। একইভাবে তিনি পীর-মুরিদি বা সুফিবাদের কিছু ধারণা – যেমন 'ফানা ফিশ শায়খ' বা 'ফকর'-এর বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং কুরআন-সুন্নাতের আলোকে সেগুলো যাচাই করেছেন।

তার মতে, কোনো ধারণা যদি মানুষের স্বাধীনতা বা আল্লাহর একত্বের বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তবে তা নিয়ে আলোচনা করা জরুরি। এমনকি কিছু হাদিসও তিনি গভীর সতর্কতার সাথে গ্রহণ করেছেন। যেমন: "দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার" (মুসলিম, হাদিস নম্বর: ৭৬০৯) বর্ণনাটিকে তিনি কেবল আক্ষরিক অর্থে না দেখে এর আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করার যুক্তি দিয়েছেন।

এই মানসিক সাহসের কারণেই তিনি ইসলামি আইনের প্রয়োগ নিয়ে মন্তব্য করতে পেরেছেন। যেমন – ব্যভিচার প্রমাণের কঠিন শর্ত বা সাক্ষ্যের নিয়মগুলো কোনো প্রেক্ষাপটে সামাজিক ন্যায়বিচারের পথে বাধা হচ্ছে কি না, তা তিনি ভেবে দেখতে বলেছেন। তার মতে, এ জাতীয় নিয়মগুলোকে অপরিবর্তনীয় না ভেবে সেগুলোর ভেতরের প্রজ্ঞা ও ব্যবহারিক দিকটি পুনর্বিবেচনা করা উচিত। তার এই সমালোচনা কেবল মুসলিম ঐতিহ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি পশ্চিমা মতাদর্শ – যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ এবং বস্তুবাদকেও কঠোরভাবে পরীক্ষা করেছেন। তার কাজগুলো পশ্চিমা চিন্তাধারার অস্পষ্টতা ধরিয়ে দিয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। তবে তার কোনো সমালোচনাই সস্তা আবেগ বা ধ্বংসাত্মক মানসিকতা থেকে আসেনি; বরং তা ছিল গভীর জ্ঞান ও সংস্কারের প্রচেষ্টামাত্র। এটা রক্ষণশীলতার স্থবিরতায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে এবং আধুনিকতার প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার সাহস দিয়েছে।

এই তিনটি ক্ষেত্রে অবদানের পর তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব দেখা যায় চতুর্থ ক্ষেত্রে। এখানে তিনি ধর্মকে কেবল কিছু বিচ্ছিন্ন নিয়ম হিসেবে না দেখে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসংগঠিত জীবনব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরেছেন। এই স্তরে তিনি কেবল একজন তাফসিরকার বা আলেম নন, বরং একটি নতুন ব্যাখ্যার অগ্রদূত এবং মৌলিক চিন্তার স্থপতি হিসেবে আবির্ভূত হন।

এই পর্যায়ে মওলানা মওদুদির সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা ধর্মের একটি সামগ্রিক পুনর্গঠনে রূপ নেয়। এখানে জ্ঞান কেবল পুরনো মূলনীতি সংকলনের মধ্যে আটকে থাকে না, বরং একটি আধুনিক ও সভ্যতাগত কাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে পূর্ণতা পায় – যা অতীতের সাথে যুক্ত থেকেও ভবিষ্যতের পথ দেখায়।

তিনি ইসলামি চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন।তিনি ধর্মকে কেবল ব্যক্তিগত নাজাত বা ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একে একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরেছেন।তার এই ব্যাখ্যায় রাষ্ট্র ইলাহি বিধান বাস্তবায়নের মূল কেন্দ্র। তার কাছে ধর্ম হলো সমাজ, অর্থনীতি, আইন, রাজনীতি ও সভ্যতার এক সমন্বিত রূপ। তিনি ধর্মকে কেবল ওয়াজ-নসিহতের গণ্ডি থেকে বের করে একটি সুসংগঠিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করেছেন।

তার 'কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা' বইটি এই চিন্তাধারার মজবুত ভিত্তি স্থাপন করে।এখানে তিনি কুরআনের মূল শব্দগুলোকে গভীর ও বিস্তৃত অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ইসলাম এবং জাহিলিয়াতের মধ্যে একটি পরিষ্কার রেখা টেনেছেন এবং আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতাকে 'আধুনিক মূর্খতা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।তার প্রস্তাবিত ইসলামি ব্যবস্থা মানুষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, আইনি ও রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ সমাধান দেয়।তার 'তেহরিকে ইসলামি কা আয়েন্দা লায়েহা-আমল' (ইসলামি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি), 'ইসলামি দস্তুর কি তাদভিন' (ইসলামি সংবিধান প্রণয়ন) এবং 'ইসলাম আওর জাদিদ মাআশি নজরিয়াত' (ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ)-এর মতো লেখাগুলো কেবল সংস্কারবাদী প্রস্তাব নয়।সেগুলো একটি ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সভ্যতার রূপরেখার প্রতিনিধিত্ব করে।সেগুলোতে ধর্মকে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ও সামাজিক মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে আইন, ক্ষমতা, নৈতিকতা এবং দাওয়াত একটি ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রে মিলিত হয়।এই ব্যাখ্যাটি কেবল কোনো তাত্ত্বিক কথা নয়, বরং এটা সংস্কারের চেতনা, বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই এবং ইজতিহাদি সাহসের এক জীবন্ত সমন্বয়।মওলানা মওদুদি ধর্মকে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা বা ব্যক্তিগত মুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং তিনি একে সাংস্কৃতিক ভাষা এবং বাস্তব শাসনের ভাষায় নতুন করে উপস্থাপন করেছেন।তিনি ইসলামের আলাদা আলাদা বিষয়গুলো – যেমন মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র পরিচালনা, জ্ঞান, আইন এবং নৈতিকতাকে – একত্রে মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরেছেন।

এই কৃতিত্বই একজন চিন্তাবিদকে কেবল একজন সাধারণ আলেমের মর্যাদা থেকে একজন যুগান্তকারী ব্যক্তিত্বে উন্নীত করে।এই বিন্দুতেই মওলানা মওদুদির বুদ্ধিবৃত্তিক উচ্চতা কেবল একজন মুফাসসির, ফকিহ বা ওয়ায়েজের চেয়ে অনেক উপরে উঠে যায়। তিনি একজন সভ্যতার স্থপতি, সংস্কারবাদী চিন্তাবিদ এবং ইসলামি ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণকারী বা মুজাদ্দিদ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন – যিনি কেবল ঐতিহ্যের রক্ষক নন, বরং এর সমালোচক, সংস্কারক এবং নির্মাতা।

মওলানা মওদুদির বিশ্বাসগত কাঠামো, চিন্তার ধরন বা তার ব্যাখ্যা নিয়ে কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু ইসলামি ইতিহাসের কোনো সিরিয়াস ছাত্র এই সত্য অস্বীকার করতে পারবেন না যে, তিনি এ ঐতিহ্যের এক সুউচ্চ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।তিনি ছিলেন এমন একজন চিন্তাবিদ, যিনি তার সময়ে একাই ইসলামি চিন্তাধারাকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা, নতুন ভাষা এবং নতুন এক জীবনীশক্তি দান করেছিলেন।

সাহিত্য : কবিতা

জাভেদ আহমেদ গামিদি

یاد آتا ہے کبھی اُن کی جھلک دیکھی تھی
کوئی گزرا تھا کہ خوشبو کی لہک دیکھی تھی

ইয়াদ আতা হ্যায় কভি উনকি ঝলক দেখি থি,
কোই গুজরা থা কি খুশবু কি লেহাক দেখি থি।
মনে পড়ে কভু তার ঝলক দেখেছিলাম,
যেন কারো চলে যাওয়ার খুশবু দেখেছিলাম।

زلف لہرائی تھی ، عارض تھا ، جبیں تھی شاید
چاندنی اٹھتی ہوئی سوے فلک دیکھی تھی

জুলফ্ লহরাই থি, আরিজ থা, জবিঁ থি শায়েদ,
চাঁদনি উঠতি হুই সু-এ-ফালাক দেখি থি।
উড়োকেশ ছিল, কপোল ছিল, হয়ত ললাট,
যেন দেখেছিলাম জোছনা উদয় হতে।

کوئی چہرہ تھا ، اشارت کہ تخیل کا فسوں
رنگ دیکھے تھے کہ پھولوں کی مہک دیکھی تھی

কোই চেহরা থা, ইশারত কেহ তাখায়্যুল কা ফুঁসু,
রং দেখে থে কি ফুলোঁ কি মেহেক দেখি থি।
মুখাবয়ব ছিল কোনো, ইশারা অথবা কল্পনার মায়া,
রং দেখেছিলাম, যেন শুধু ওই ফুলের সুবাস।

ہ بھی ہو سکتا ہے دیکھا ہو تبسم اُن کا
اتنا معلوم ہے غنچے کی چٹک دیکھی تھی

ইয়ে ভি হো সকতা হ্যায় দেখা হুঁ তাবাসসুম উনকা,
ইতনা মালুম হ্যায় গুঞ্চে কি চাটাক দেখি থি।
এটাও হতে পারে যে, তার মৃদু হাসি দেখেছিলাম;
এতটুকু জানি, ফুলের কুঁড়ি ফুটতে দেখেছিলাম।

وشنی تھی تو کوئی چاند بھی نکلا ہو گا
اک خیال آیا تھا ، جگنو کی چمک دیکھی تھی

রোশনি থি তো কোই চাঁদ ভি নিকলা হোগা,
এক খেয়াল আয়া থা, জুগনু কি চমক দেখি থি।
আলো ছিল, নিশ্চয়ই কোনো চাঁদ উঠেছিল;
শুধু খেয়াল এসেছিল, জোনাকির ঝলক দেখেছিলাম।

کوئی آواز تھی ، شعلہ تھا کہ پیراہن تھا
گل ہی دیکھا تھا کہ بلبل کی چہک دیکھی تھی!

কোই আওয়াজ থি, শোলা থা কেহ প্যয়রাহন থা,
গুল হি দেখা থা কেহ বুলবুল কি চাহাক দেখি থি।
কোনো আওয়াজ ছিল বা আগুনের শিখা, অথবা পোশাক ছিল;
কেবল ফুলই দেখেছিলাম যেন বুলবুলির গান দেখেছিলাম।

اب تو ہر سانس کی فرحت ہے یہی درد فراق
وہ بھی کیا دن تھے کہ جب اِس کی کسک دیکھی تھی

আব তো হার সাঁস কি ফরহাত হ্যায় ইয়াহি দর্দ-এ-ফিরাক,
ওহ ভি ক্যায়া দিন থে কেহ জব ইসকি কাসাক দেখি থি।
এখন প্রতিটি নিঃশ্বাসে শুধু বিচ্ছেদের আনন্দ।
সেটাও কেমন দিন ছিল, যেদিন এর ঝাঁঝালো যন্ত্রণা অনুভব করেছিলাম।